ইসলাম

(লেকচার সিয়ালকোট)

যুগ-ইমাম ও মুজাদ্দেদ, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী
হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানী (আ.)-এর
ঐতিহাসিক ভাষণ যা ২রা নভেম্বর ১৯০৪ইং সনে
সিয়ালকোটের জনসভায় পাঠ করা হয়।

লেকচার সিয়ালকোট

লেখক ঃ হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
ভাষান্তর ঃ মাওলানা ফিরোজ আলম
১ম সংস্করণ ঃ নভেম্বর, ১৯০৪ উর্দূ
বিগত সংস্করণ ঃ ২০০৪ (বাংলাদেশ)
২০০৯,২০১৫(কাদিয়ান)
বর্তমান সংস্করণ ঃ নভেম্বর, ২০১৯
সংখ্যা ঃ ১০০০
প্রকাশক ঃ নাযারত নশর ও এশায়াত ,সদর আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়া,
কাদিয়ান, গুরুদাসপুর, পাঞ্জাব
মূদ্রণে ঃ ফজল-এ-ওমর প্রিন্টিং প্রেস, কাদিয়ান, গুরুদাসপুর,
পাঞ্জাব

Title : Lecture Sialkot
Author : Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as)
Translator : Maulana Firoz Alam
1st Edition : November 1904 urdu
Previous Editions : 2004 (Bangladesh),
2009,2015 (Qadian)
Present Edition : November 2019
Copies : 1000
Published by : Nazarat Nashr-o-Ishaat ,
Sadr Anjuman Ahmadiyya,
Qadian, Gurdaspur, Punjab
Printed at : Fazle Umar Printing Press,
Qadian, Gurdaspur, Punjab

লেখক পরিচিতি

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (১৮৩৫-১৯০৮)

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা

بسم الله الرحمن الرحيم

উপক্রমণিকা

সৈয়্যদনা হযরত আকদস মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ ও ইমাম মাহদী (আ.) র ঐতিহাসিক বক্তৃতা যা ২রা নভেম্বর, ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে সিয়ালকোটের জনসভায় পাঠ করা হয় সর্বপ্রথম উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হয় । পরবর্তিতে এর প্রথম বাংলা সংস্করণ ২রা জানুয়ারী ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়।

পুস্তকটি নতুন আঙ্গিকে কম্পোজিং করেছেন মোকাররমা বুশরা হামিদ সাহেবা এবং আরবী সহ সম্পূর্ণ সেটিং এর দায়িত্ব পালন করেছেন মোকাররম কাজী আয়াজ মহম্মদ সাহেব, মোয়াল্লিম সিলসিলা। পুস্তকটি পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছেন মোকাররম জাহিরুল হাসান সাহেব ইনচার্জ বাংলা ডেস্ক কাদিয়ান, মোকাররম আবুতাহের মণ্ডল সাহেব সদর রিভিউ কমিটি বাংলা এবং মোকাররম শেখ মহম্মদ আলী সাহেব সদর এশায়া’ত কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ। পুস্তকটিতে মাওলা বখশ সাহেবের পত্রটিকেও অন্তর্গত করা হয়েছে। যা বাংলা অনুবাদের প্রথম সংস্করণে শামিল ছিল না।

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ আল খামিস (আইঃ) এর অনুমোদনে প্রথমবার পুস্তকটির বাংলা সংস্করণ কাদিয়ান থেকে প্রকাশ হচ্ছে।

পুস্তকটি প্রকাশে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে আল্লাহ্‌তা’লা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন এবং ইহার মুদ্রণ সর্বদিক থেকে কল্যাণময় করুন।

নভেম্বর ২০১৯

হাফিয মখদুম শরীফ
নাযির নশর ও এশায়া’ত কাদিয়ান

প্রকাশকের কথা

২রা নভেম্বর, ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে সিয়ালকোটে এক বিশাল জনসভায় হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) একটি ঐতিহাসিক বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন। এর শিরোনাম ছিল ‘ইসলাম’। পরবর্তীতে এটাই লেকচার সিয়ালকোট নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং ‘রূহানী খাযায়েনের’ ২০তম খন্ডে সন্নিবেশিত হয়। উর্দু ভাষায় প্রদত্ত এ লেকচারের বঙ্গানুবাদ করেছেন লন্ডনে বসবাসরত সিলসিলার মুরুব্বী মৌলানা ফিরোজ আলম। এ কাজে তাঁকে সহায়তা করেছেন জনাব সুলতান আহমদ ও জনাব আব্দুল্লাহ শামস বিন তারেক। বাংলা ভাষায় এ পুস্তিকাটি প্রকাশে এ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান সাহেবের উদ্যোগ, পৃষ্ঠপোষকতা সত্যিই প্রশংসনীয়। আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর, জনাব মুবাশ্বের উর রহমান সাহেবকে তাঁর সুদৃষ্টি ও উৎসাহ প্রদানের জন্যে ধন্যবাদ জানাই। মূল বই-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রুফ রিডিং-এ সাহায্য করেছেন সর্ব জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ও হামিদুর রহমান। এ পুস্তিকাটির প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহতালা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। এ পুস্তিকাটি যেন বাংলা-ভাষীদের জন্য হেদায়াত ও ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয় এ দোয়া করছি।

প্রকাশক
(বাংলাদেশ)

آمد مہدیؑ معہودؑ مبارک ہووے   مقدم عیسیٰ موعودؑ مبارک ہووے
آج سلکوٹ ہوا غیرت فردوس وارم   شرف افزائیٔ مسعود مبارک ہووے
آ گیا آج وہ دنیا میں امام اعظم   حکم عادل و محمود مبارک ہووے
بطفیل اس کے ہمیں بخش تو مولائے کریم!   فضل و رحمت تیری اور جود مبارک ہووے

সিয়ালকোটের পূণ্যভূমি কে আল্লাহ্ তা'লা এমন সৌভাগ্য দান করেছেন যে সেখানে খোদা তা'লার পবিত্র সিলসিলার প্রতি শুভাকাঙ্খী এবং পুত-পবিত্র হৃদয়ের অধিকারীগণ সংখ্যাধিক্য ভাবে বিদ্যমান। যখন হুযুর মসীহ্ মাউদ (আ.) লাহোর সফর সমাপ্ত করে প্রত্যাবর্তণ করেন তখন সিয়ালকোট জামাতের আন্তরিক আবেদনের প্রেক্ষিতে হুজুর (আ.) যিনি করুণা ও দয়ার মূর্তিমান স্বরূপ ছিলেন, ২৭ অক্টোবর ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে সপরিবার ও সবান্ধব পারিষদ সহযোগে রেল মাধ্যমে লাহোর থেকে সিয়ালকোটে আগমন করেন। পথিমধ্যে সমস্ত স্টেশনে স্থানীয় জামাতগুলির সদস্যগণ খুবই উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হয়। এবং সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার সময় তিনি সিয়ালকোট স্টেশনে এসে উপস্থিত হন। বিরোধী মৌলবী পূর্ব হতেই মৌলনা মৌলবী আবদুল করীম সাহেবের ওয়াজে ক্রোধান্বিত হয়ে জন সাধারনকে উত্যক্ত করতে ব্যস্ত ছিল। তারা নিজেদের ওয়াজে বলা শুরু করেছিল যে ব্যক্তি মির্যা সাহেবকে দেখতে পর্যন্ত যাবে তার নিকাহ বাতিল গন্য হবে। এবং সে ধর্মত্যাগী সাব্যস্ত হবে। অথচ খোদা কবেই বা এমন বিরোধীদের কিছু মাত্র সহায় হয়েছেন। জণগণের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এমন আবেগ ও উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল যে পূর্ব হতেই হাজার হাজার লোক রেলওয়ে স্টেশন, প্লাটফর্ম, রাজপথ এবং বাজারে উপস্থিত হয়ে যায়। আর হুজুরের আগমনে বিশাল এক জনসমূদ্র মেলার আকার ধারন করে। এবং সপ্তাহ ব্যাপী সিয়ালকোটে ধর্মের প্রতি সেই উৎসাহ উদ্দীপনা বিরাজমান ছিল যে আজও পর্যন্ত যার কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

সিয়ালকোট জামাত আথিথেয়তা এবং আপ্যায়নের যে সুব্যবস্থা করেছিল তা খুবই প্রশংসনীয় ছিল। ঘটনাক্রমে সিয়ালকোট জামাতের জন্য এটি খুবই সৌভাগ্যের মুহুর্ত যে তাদের মধ্যে অবস্থান করে খোদার মসীহ্ এই সন্দর্ভটিকে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং পাঠ করিয়েছেন। হে এই শহরের অধিবাসীবৃন্দ! যাকে খোদা তাআলার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ নিজের জন্মস্থানের ন্যায় প্রিয় মনে করেছেন। তোমাদের মোবারক হোক যে খোদার মসীহ্ তোমাদের মধ্যে আগমন করেছেন আর এই মহান জলসার সম্মান তোমরা লাভ করেছ। হে এই পূন্যভূমি তোমাকেও শুভেচ্ছা। তুমি আনন্দের গান গাও যে তোমার মধ্যে মেহেদীর আগমন হয়েছে।

হে খোদার মসীহ্ হে কৃষ্ণ রুদ্র গোপাল জগতে তোমার মহিমা রচিত হোক। তোমার পদার্পণের কল্যাণে লোক যেন হেদায়তের জ্যোতি লাভ করে। আর অমানিশার পাতাল থেকে তাদের যেন মুক্তির স্বাদ লাভ হয়। আমিন।

খাকসার মাওলা বখশ আহমদী ভাট্টি
সাকিন চোন্ডা, তাহসীল যাফরওয়াল, জেলা সিয়ালকোট
অধুনা নায়েব মোহাফিয দফতর, জেলা সিয়ালকোট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

ইসলাম

পৃথিবীর ধর্মগুলোর ওপর দৃষ্টিপাতে প্রতীয়মান হয়, ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্মে কোন না কোন ভ্রান্তি রয়েছে। এর কারণ এই নয় যে, সেসব ধর্ম প্রথম থেকেই মিথ্যা। বরং এটা এজন্য যে, ইসলামের আবির্ভাবের পর খোদাতাআলা সেসব ধর্মের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন এবং সেসব ধর্ম এখন এমন বাগানে পরিণত হয়েছে যার কোন মালী নেই আর যাতে পানি সিঞ্চন ও পরিচ্ছন্নতার কোন ব্যবস্থা নেই। সে কারণে ধীরে ধীরে এসব ধর্মে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিতে থাকে এবং সব ফলবান বৃক্ষ শুকিয়ে এর জায়গায় কাঁটা ও আগাছা বিস্তার লাভ করে। ধর্মের মূল হলো আধ্যাত্মিকতা তা পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায়। শুধু শুষ্ক শব্দাবলী বাকী থাকে। কিন্তু ইসলামের সাথে খোদা এমন করেননি। তিনি যেহেতু এ বাগানের চির সবুজ থাকাকে পছন্দ করেছেন তাই তিনি প্রত্যেক শতাব্দীতে এ বাগানে নতুনভাবে পানি সিঞ্চনের ব্যবস্থা করেছেন এবং একে শুকিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। যদিও প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে যখনই খোদার কোন বান্দা সংশোধনের নিমিত্তে দণ্ডায়মান হয়েছেন, অজ্ঞরা তাঁর বিরোধিতা করতে থাকে এবং কোন ভ্রান্তি এমন যা তাদের প্রথা এবং অভ্যাসের অংশ হয়ে যায় এর সংশোধন তাদের দৃষ্টিতে একান্ত অপছন্দনীয় ঠেকে, কিন্তু আল্লাহতাআলা স্বীয় সুন্নতকে পরিত্যাগ করেন নি। এমন কি আখেরী যুগে, হেদায়াত ও ভ্রষ্টতার শেষ যুদ্ধে খোদাতাআলা চতুর্দশ (১৪০০) শতাব্দীর শিরোভাগে মুসলমানদেরকে উদাসীনতায় পেয়ে স্বীয় প্রতিশ্রুতিকে পুনরায় স্মরণ করেছেন এবং ইসলাম ধর্মের সংস্কার করেছেন। কিন্তু আমাদের নবী (সা.)-এর আগমনের পর অন্যান্য ধর্মের ভাগ্যে এ সংস্কার জোটে নি। তাই সেসব ধর্ম মরে যায়। সেসব ধর্মে কোন আধ্যাত্মিকতা বাকী থাকে নি। অনেক ভুল-ভ্রান্তি সেসব ধর্মে এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে যায় যেভাবে বহুল ব্যবহৃত কাপড় কখনো না ধোয়া

এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে যায় যেভাবে বহুল ব্যবহৃত কাপড় কখনো না ধোয়া হলে ময়লা ধরে রাখে আর এমন সব মানুষ যাদের আধ্যাত্মিকতার সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না এবং যাদের অবাধ্য আত্মা নীচ ও হীন জীবনের কলুষতা থেকে মুক্ত ছিল না তারা নিছক কামনা-বাসনার তাগিদে সেসব ধর্মে অযথা হস্তক্ষেপ করেছে এবং সেগুলোর চেহারা এমনভাবে বিকৃত করেছে যে, আজ সেসব ধর্মকে ভিন্ন কিছু বলে মনে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ খ্রীষ্টধর্মকে দেখ। সূচনাতে কেমন পূত-পবিত্র নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। হযরত ঈসা (আ.) যে শিক্ষা উপস্থাপন করেছেন, কুরআনী শিক্ষার তুলনায় তা যদিও অসম্পূর্ণ, কেননা পরিপূর্ণ শিক্ষার সেটি সময়ও ছিল না আর দুর্বল মানসিক অবস্থা সে শিক্ষা গ্রহণেরও উপযুক্ত ছিল না তথাপি স্বীয় যুগ অনুসারে সে শিক্ষা ছিল একান্ত উত্তম। এটা সেই খোদার পানে পথ প্রদর্শন করতো যে দিকে তওরাত পথ প্রদর্শন করেছে। কিন্তু হযরত মসীহ্ (আ.)-এর পর এক ভিন্ন খোদা খ্রীষ্টানদের খোদা হয়ে যায়। এর কোন উল্লেখ তওরাতের শিক্ষায়ও ছিল না, আর বনী ইসরাঈল এরূপ ধারণার সাথে পরিচিতও ছিল না। সেই নতুন খোদার উপর ঈমান আনার ফলে তওরাতের ধারা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। পাপ থেকে সত্যিকার অর্থে পরিত্রাণ এবং পবিত্রতা লাভের যেসব নির্দেশনা তওরাত দিয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে এলোমেলো হয়ে যায়। পাপ থেকে মুক্ত হওয়া শুধু এ অঙ্গীকারেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায় যে, পৃথিবীকে মুক্তি দেয়ার জন্যে হযরত ঈসা (আ.) স্বয়ং ক্রুশে আরোহণ করেছেন এবং তিনি স্বয়ং খোদাই ছিলেন। শুধু এতটুকুই নয় বরং তওরাতের অনেক স্থায়ী আদেশ-নিষেধকে লংঘন করা হয় এবং খ্রীষ্টান ধর্ম এমনভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায় যে, স্বয়ং হযরত ঈসা (আ.)-ও যদি দ্বিতীয় বার আগমন করেন তবে তিনি এ ধর্মকে সনাক্ত করতে পারবেন না। অতি আশ্চর্যের বিষয় হলো, যাদেরকে তওরাত অনুসরণের তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তারা পুরোপুরি তওরাতের নির্দেশাবলীকেও পরিত্যাগ করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইঞ্জিলের কোথাও নির্দেশ নেই যে, তওরাতে শূকর নিষিদ্ধ, আর আমি তোমাদের জন্য তা হালাল করছি; আবার তওরাতে খৎনার যে জোরালো নির্দেশ রয়েছে আমি সে নির্দেশ রহিত ঘোষণা করছি। তাই প্রশ্ন হলো, যেসব কথা ঈসা (আ.)-এর মুখ থেকে নিঃসৃত হয় নি সেগুলো তাঁর ধর্মে অনুপ্রবেশ ঘটানো কীভাবে সঙ্গত হতে পারে? কিন্তু একটি বিশ্বধর্ম অর্থাৎ ইসলাম পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করা যেহেতু খোদার জন্য আবশ্যক

ছিল তাই ইসলামের আবির্ভাবের জন্য খ্রীষ্ট ধর্মের বিকৃতি একটি পূর্ব-লক্ষণস্বরূপ ছিল। এ কথাও প্রমাণিত সত্য যে, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে হিন্দু ধর্মও বিকৃত হয়ে যায়। সমগ্র ভারতে মূর্তি পূজার প্রচলন হয়ে যায়। আর সেই বিকৃতিরই এটি রেখে যাওয়া ছাপ যে, যেই খোদা স্বীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য কোন বস্তুর মুখাপেক্ষী নন, এখন আর্য সাহেবদের দৃষ্টিতে তিনি সৃজনের জন্য অবশ্যই বস্তুর মুখাপেক্ষী। এ বিকৃত বিশ্বাসের কারণে তাদেরকে আরেকটি বিকৃত বিশ্বাসকেও গ্রহণ করতে হয়েছে যা শিরকে ভরপুর অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত কণিকা, সকল রূহ্ চিরস্থায়ী ও অনাদি। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তারা খোদার বৈশিষ্ট্যাবলীর উপর যদি একটিবারও গভীর দৃষ্টিপাত করতো তা হলে এমন কথা কখনও বলতে পারতো না। সৃজনী-বৈশিষ্ট্য আদি থেকে খোদার সত্তার অংশ। মানুষের মত তিনি কোন বস্তুর মুখাপেক্ষী হলে কী কারণে তিনি তাঁর শ্রবণ ও দর্শনের বৈশিষ্ট্যে মানুষের মত কোন বস্তুর মুখাপেক্ষী হবেন না? মানুষ বায়ুর মাধ্যম ছাড়া কিছু শুনতে পায় না আর আলোর মাধ্যম ছাড়া কিছু দেখতেও পায় না। প্রশ্ন হলো, পরমেশ্বর কি নিজের মাঝে এমন কোন দুর্বলতা রাখেন? তিনিও কি শ্রবণ ও দর্শনের জন্য বায়ু ও আলোর মুখাপেক্ষী? সুতরাং তিনি বায়ু ও আলোর মুখাপেক্ষী নন। নিশ্চিত জেনো সৃজনী-বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেও তিনি কোন বস্তুর মুখাপেক্ষী নন। খোদা তাঁর গুণাবলী প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন বস্তুর মুখাপেক্ষী এ যুক্তি নিছক মিথ্যা। মানবীয় গুণাবলীকে খোদার সাথে তুলনা করা, অর্থাৎ এ ধারণা করা যে, অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বের জন্ম হতে পারে না এবং মানবীয় দুর্বলতাসমূহকে খোদার ওপর চাপানো বড় ভ্রান্তি। মানুষের সত্তা সসীম আর খোদার সত্তা অসীম, তাই তিনি স্বীয় সত্তার শক্তিবলে আরেকটি সত্তাকে সৃষ্টি করে থাকেন। এটিই তো ঈশ্বরত্ব। তিনি স্বীয় কোন বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে বস্তুর মুখাপেক্ষী নন, নতুবা তিনি খোদা নন। তাঁর কাজে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে কি? দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি নিমিষে পৃথিবী এবং আকাশ সৃষ্টি করতে চাইলে তিনি কি তা পারেন না? হিন্দুদের মাঝে যাদের জ্ঞানের পাশাপাশি কিছুটা আধ্যাত্মিকতাও ছিল, যারা শুধু নিরস যুক্তির শৃংখলে আবদ্ধ ছিলেন না, তাদের কখনও তেমন বিশ্বাস ছিল না, যা সম্প্রতি পরমেশ্বর সম্পর্কে আর্য সাহেবানরা পেশ করছেন। এটি একান্ত রূহানীয়ত-শূন্যতার ফসল। মোট কথা এমন সব বিকৃতি এ সকল ধর্মে দেখা দিয়েছে এর কোন কোনটি বলতেও বাধে আর

এগুলো মানবীয় পবিত্রতারও পরিপন্থী। এসব লক্ষণ ছিল ইসলামের অপরিহার্যতার স্বাক্ষর। একজন বিবেকবান ব্যক্তিকে স্বীকার করতে হয়, ইসলামের আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্বে সব ধর্ম নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং আধ্যাত্মিকতা হারিয়ে গিয়েছিল। সুতরাং নবী (সা.) সত্য প্রকাশের লক্ষ্যে এক মহান সংস্কারক ছিলেন। তিনি অবলুপ্ত সত্যকে পুনরায় ধরাতে নিয়ে এসেছেন। এ গৌরবে আমাদের নবী (সা.)-র সাথে অন্য কোন নবীই শরীক নন। প্রকৃতপক্ষে তিনি সারা পৃথিবীকে এক অন্ধকারে পেয়েছেন আর তাঁর আবির্ভাবে সেই অন্ধকার আলোতে বদলে গেছে। যে জাতিতে তিনি এসেছেন ততক্ষণ তিনি মৃত্যুবরণ করেন নি যতক্ষণ সেই পুরো জাতি পৌত্তলিকতার আবরণ খুলে একত্ববাদের আবরণ পরে নিয়েছে। শুধু এটাই নয় বরং তাঁরা ঈমানের উন্নত মার্গে পৌঁছে গেছেন এবং তাঁদের দ্বারা নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও ঈমানের এমন কার্যাবলী সাধিত হয়েছে যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যায় না। এ সাফল্য এবং এ মার্গের সফলতা আঁ হযরত (সা.) ছাড়া অন্য আর কোন নবীর ভাগ্যে জোটে নি। আঁ হযরত (সা.)-এর নবুয়তের সত্যতার পক্ষে এটিই একটি বড় প্রমাণ যে, তিনি এমন এক সময়ে প্রেরিত ও আবির্ভূত হয়েছেন, যখন যুগ চরম পর্যায়ের অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছিল আর স্বভাবতঃই এক মহান সংস্কারককে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। অতঃপর তিনি এমন একটি সময়ে ইন্তেকাল করেছেন যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ শির্‌ক এবং মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে তওহীদ (একত্ববাদ) ও সঠিক পথকে অবলম্বন করেছিল। আর প্রকৃতপক্ষে এ কামেল ও পরিপূর্ণ সংশোধন তাঁরই (সা.) বিশেষত্ব। তিনি একটি বন্য স্বভাবের ও পশু প্রকৃতির জাতিকে মানবীয় অভ্যাস শিখিয়েছেন। অথবা অন্য কথায় বলা যায়, পশুকে তিনি মানুষ বানিয়েছেন আর মানুষকে শিক্ষিত মানুষে পরিণত করেছেন এবং শিক্ষিত মানুষকে খোদা-প্রেমিক বানিয়েছেন এবং তাদের মাঝে আধ্যাত্মিকতার নিগূঢ় মন্ত্র ফুৎকার করেছেন এবং সত্য খোদার সাথে তাদের সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছেন। তাদেরকে খোদার পথে ছাগলের মত জবাই করা হয়েছে। তারা পিপীলিকার মত পদতলে পিষ্ট হয়েছেন; কিন্তু ঈমানকে নষ্ট হতে দেননি, বরং সব বিপদের সময় সামনে অগ্রসর হয়েছেন। তাই নিঃসন্দেহে আমাদের নবী (সা.) আধ্যাত্মিকতা প্রতিষ্ঠার নিরিখে দ্বিতীয় আদম ছিলেন। বরং সত্যিকারের আদম তিনিই ছিলেন যাঁর মাধ্যমে এবং যাঁর কল্যাণে মানবীয় গুণাবলী উৎকর্ষ লাভ করেছে এবং পুণ্য শক্তিসমূহ স্ব স্ব কাজে নিয়োজিত হয়েছে। মানব প্রকৃতির কোন শাখা ফুল-ফল শূন্য থাকে নি।

নবুয়ত তাঁর সত্তাকে শুধু যুগের পরিসমাপ্তির কারণে শেষ হয় নি, বরং নবুয়তের পরাকাষ্ঠা তাঁর ভিতর পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। তাছাড়া তিনি যেহেতু ঐশী গুণাবলীর পরিপূর্ণ বিকাশস্থল ছিলেন তাই তাঁর শরীয়ত যুগপৎ জালালী ও জামালীর (প্রতাপ ও সৌন্দর্যের) বৈশিষ্ট্যে মন্ডিত ছিল। তাঁর দুটি নাম **মুহাম্মদ ও আহমদের (সা.)** পিছনে এটিই উদ্দেশ্য। তাঁর সার্বজনীন নবুয়তে কার্পণ্যের কোন দিক নেই; বরং সূচনা থেকেই তা বিশ্বজনীন। তাঁর নবুয়তের সত্যতার আর একটি প্রমাণ সব নবীর কিতাব থেকে এবং একইভাবে **কুরআন শরীফ** থেকেও পাওয়া যায়। এ হলো খোদাতাআলা আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ অবধি পৃথিবীর বয়স সাত হাজার বছর নির্ধারণ করেছেন। আর হেদায়াত ও ভ্রষ্টতার জন্য এক এক সহস্র বছরের যুগ নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ এক যুগে হেদায়াতের জয়জয়কার আর দ্বিতীয় যুগ সেটি, যখন পথভ্রষ্টতা ও বিপথগামিতার বিজয় হয়। আমি উল্লেখ করেছি, ঐশী কিতাবসমূহে এ উভয় যুগকে এক এক সহস্র বছরে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম যুগ হেদায়াতের বিজয়ের যুগ ছিল। এ যুগে মূর্তিপূজার নাম গন্ধও ছিল না। যখন এ হাজার বছরের অবসান ঘটে তখন হাজার বছরের দ্বিতীয় যুগে পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকারের মূর্তিপূজা আরম্ভ হয়ে যায়, আর শিরকের বাজার সরগরম হয়ে ওঠে এবং সব দেশে মূর্তিপূজা স্থান করে নেয়। এরপর তৃতীয় যুগ যা সহস্রাব্দের ছিল তাতে তৌহীদের গোড়াপত্তন হয় এবং আল্লাহ্ যতটা চেয়েছেন একত্ববাদ পৃথিবীতে প্রসার লাভ করেছে। পরে চতুর্থ সহস্রাব্দে ভ্রষ্টতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে আর সেই চতুর্থ হাজারে বনী ইসরাঈল মারাত্মকভাবে বিনষ্ট হয়ে যায় আর আর খ্রীষ্টান ধর্মের অঙ্কুরেই বিনাশ ঘটে। এর জন্ম এবং মৃত্যু যেন সমসাময়িক যুগে ঘটেছে। এরপর আসে পঞ্চম সহস্র। এটা ছিল হেদায়াতের যুগ। এটি সেই সহস্রাব্দ যখন আমাদের নবী (সা.) আবির্ভূত হয়েছেন এবং আল্লাহ্ তাআলা আঁ হযরত (সা.)-এর হাতে তৌহীদকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সুতরাং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর (সা.) আবির্ভূত হওয়ার এটি একটি জোরালো প্রমাণ যে, তাঁর আবির্ভাব সে সহস্রে হয়েছে তা আদি থেকে হেদায়াতের জন্য নির্ধারিত ছিল। আমি এ কথা নিজের পক্ষ থেকে বলছি না, বরং ঐশী কিতাব থেকে এটিই প্রমাণিত হয় এবং একই প্রমাণের ভিত্তিতে আমার **প্রতিশ্রুত মসীহ্** হওয়ার দাবীও প্রতিষ্ঠিত হয়। কেননা এ বিভাগ অনুসারে ষষ্ঠ সহস্র ভ্রষ্টতার সহস্র এবং এটা হিজরতের তিনশ' বছর পর আরম্ভ হয়ে চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে শেষ হয়। এ ষষ্ঠ সহস্রের লোকদের নাম আঁ

হযরত (সা.) **ফয়জে আওয়াজ** (বা বক্র প্রজন্ম) রেখেছেন। আর সপ্তম সহস্র। হেদায়াতের সহস্র। এতে আমরা এখন বসবাস করছি। যেহেতু এটি শেষ সহস্র তাই শেষ যুগের ইমামের জন্য এ সহস্রের শিরোভাগে জন্মগ্রহণ করা অবধারিত ছিল। এরপর আর কোন ইমামও নেই, কোন মসীহ্ও নেই, শুধু সে ব্যক্তি ছাড়া যে তাঁর প্রতিচ্ছায়াস্বরূপ হবে। কেননা এ সহস্রে পৃথিবীর বয়সের পরিসমাপ্তি ঘটবে- এ সম্পর্কে নবীরা সাক্ষ্য দিয়েছেন। এ ইমাম যিনি খোদাতাআলার পক্ষ থেকে মসীহ্ মাওউদ আখ্যা পেয়েছেন তিনি যুগপৎ শতাব্দী ও শেষ সহস্রাব্দের মুজাদ্দেদ। আদম থেকে শুরু করে এ যুগ যে সপ্তম সহস্রাব্দে সে বিষয়ে খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের মাঝেও মতভেদ নেই। তাছাড়া **সূরা আসরের** গাণিতিকমান থেকে আদমের যে ইতিহাস খোদা আমার নিকট প্রকাশ করেছেন তা থেকেও প্রমাণিত হয় যে, আমরা যে যুগে বসবাস করছি তা সপ্তম সহস্রাব্দ। নবীরা এ বিষয়ে ঐক্যমত ছিলেন যে, মসীহ্ মাওউদ সপ্তম সহস্রের শিরোভাগে আবির্ভূত হবেন, আর ষষ্ঠ সহস্রাব্দের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করবেন। কেননা তিনি সেভাবে সর্বশেষ যেভাবে আদম সর্বপ্রথম ছিলেন। আদম (আ.) ষষ্ঠ দিন জুমআর শেষ লগ্নে জন্মগ্রহণ করেন। যেহেতু খোদার একদিন এ পৃথিবীর হাজার বছরের সমান তাই এ সামঞ্জস্যের নিরিখে আল্লাহ মসীহ মাওউদকে ষষ্ঠ সহস্রাব্দের শেষ দিকে সৃষ্টি করেছেন। এটাও যেন দিবসের শেষ মুহূর্ত। যেহেতু প্রথম এবং শেষের মাঝে একটি সামঞ্জস্য থাকে তাই মসীহ্ মাওউদকে (আ.) আল্লাহ্ তাআলা আদমের রঙে সৃষ্টি করেছেন। আদম যমজ জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং জুমুআর দিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন, অনুরূপভাবে এ অধম মসীহ্ মাওউদ ও যমজ এবং জুমুআর দিন জন্মগ্রহণ করেছে। জন্মের ধারাবাহিকতায় প্রথমে এক মেয়ে এবং এরপর এ অধমের জন্ম। এ ধরনের জন্ম খতমে বেলায়েতের বা আল্লাহর নৈকট্যের পরিসমাপ্তির দিকে ইঙ্গিত করে। সকল নবীর এটি সর্বসম্মত শিক্ষা যে, মসীহ্ মাওউদ সপ্তম সহস্রাব্দের শিরোভাগে আসবেন। সেই কারণে বিগত বছরগুলোতে খ্রীষ্টানদের মাঝে ব্যাপক হৈ চৈ হয়েছিল। আর মসীহ্ মাওউদের যে এ যুগে আবির্ভূত হওয়ার কথা, এ বিষয়ে আমেরিকায় বেশ কয়েকটি পত্রিকায়ও প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। তিনি যে আগমন করলেন না এর কারণ কী? অনেকেই হা-হুতাশ করতে গিয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, এখন সময় পেরিয়ে গেছে, খ্রীষ্টান গীর্জাকেই তাঁর স্থলাভিষিক্ত ধরে নাও। মোদ্দা কথা হলো, এটি আমার সত্যতার প্রমাণ যে, আমি নবীগণের নির্ধারিত সহস্রাব্দে আবির্ভূত হয়েছি। অন্য কোন

প্রমাণ যদি নাও থাকতো তো এ একটি জ্বলন্ত প্রমাণই সত্যান্বেষীদের জন্য যথেষ্ট ছিল; কেননা যদি এটিকে রদ করা হয় তাহলে খোদাতাআলার সকল কিতাব বাতিল হয়ে যাবে। যারা ঐশী কিতাবের জ্ঞান রাখে এবং যারা এ নিয়ে চিন্তা করে তাদের জন্য এটি এমন একটি প্রমাণ যা আলোকোদ্ভাসিত একটি দিনের ন্যায়। এ প্রমাণকে প্রত্যাখ্যান করলে সমস্ত নবুয়ত প্রত্যাখ্যাত হয়। সমস্ত হিসেব লন্ড-ভন্ড হয়ে যায়, আর ঐশী ধারা বন্টনের সব শৃঙ্খলা বিগড়ে যায়। কেয়ামতের জ্ঞান কেউ রাখে না- মানুষের এ ধারণা সঠিক নয়। যদি তা-ই হয় তবে আদম থেকে শেষাবধি সপ্তম সহস্রাব্দে কীভাবে নির্ধারিত হতে পারে? এসব ব্যক্তি ঐশী কিতাব সম্বন্ধে যথাযথভাবে চিন্তা করে নি। এ হিসাব আমি আজ নির্ধারণ করি নি। বরং আদি থেকে এটি ঐশী কিতাবের গবেষকদের মাঝে স্বীকৃত হয়ে চলে আসছে। এমনকি ইহুদী পন্ডিতরাও এটা মেনে আসছেন। অধিকন্তু কুরআন শরীফ থেকেও পরিষ্কারভাবে এ কথা প্রমাণিত যে, আদম থেকে শেষ পর্যন্ত আদম সন্তানের বয়স সাত হাজার বছর। অনুরূপভাবে পূর্বের সকল ঐশী কিতাবও সর্বসম্মতভাবে এ কথাই বলে। তাছাড়া আয়াত -

وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ

(সূরা আল্ হাজ্জ **22:48**)

থেকেও এটিই সাব্যস্ত হয়। আর সকল নবী স্পষ্টভাবে এ সংবাদই দিয়ে আসছেন। তাছাড়া আমি এখন বলেছি, সূরা আসরের সাংখ্যমান থেকেও স্পষ্টভাবে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, আঁ হযরত (সা.) আদমের পর পঞ্চম সহস্রাব্দে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সে হিসেবের নিরিখে এ যুগ যাতে আমরা বসবাস করছি তা সপ্তম সহস্রাব্দে। যে কথা খোদা স্বীয় ওহীর মাধ্যমে আমাদের সামনে প্রকাশ করেছেন একে আমরা অস্বীকার করতে পারি না; অধিকন্তু আমরা খোদার পবিত্র নবীদের সর্বসম্মত কথাকে অস্বীকার করার কোন কারণও দেখি না। একই সাথে যেখানে এত প্রমাণ রয়েছে, আর হাদীস ও কুরআনের আলোকেও নিঃসন্দেহে এটি শেষ যুগ তাই এটি যে শেষ সহস্র সে বিষয়ে কি সন্দেহ থাকলো? আর শেষ সহস্রে মসীহ্ মাওউদ এর আগমন আবশ্যক। এই যে বলা হয়েছে, কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে তা কেউ জানে না, এর অর্থ এই নয় যে, এ সম্পর্কে কোন প্রকারেরই জ্ঞান নেই। যদি তাই হয় তাহলে কুরআন শরীফ ও সহী হাদীসে

কেয়ামতের যে সব লক্ষণ উল্লেখ করা হয়েছে তা-ও গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা এগুলোর মাধ্যমে কিয়ামত যে সন্নিকটে এর জ্ঞান লাভ হয়। আল্লাহ্ তাআলা কুরআন শরীফে লিখেছেন, শেষ যুগে ভূপৃষ্ঠে অগণিত নদ-নদী প্রবাহিত হবে, অনেক বই ছাপা হবে, এর মাঝে পত্র-পত্রিকাও অন্তর্ভূক্ত। এছাড়া উট পরিত্যক্ত হবে। আমরা দেখছি, এ সব কথা আমাদের যুগে পুরো হয়েছে। উটের স্থলে রেলের মাধ্যমে ব্যবসায়-বাণিজ্য আরম্ভ হয়ে গেছে। তাই আমরা বুঝলাম যে, কেয়ামত সন্নিকটে। তাছাড়া দীর্ঘকাল হলো, স্বয়ং খোদা আমাদেরকে اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ (সূরা আল্ ক্বামার, **54:2**) এবং অন্যান্য আয়াতে কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ দিয়ে রেখেছেন। তাই শরীয়ত এ কথা বলে না যে, কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি সকল অর্থে প্রচ্ছন্ন, বরং নবীরা শেষ যুগের লক্ষণাবলী সম্বন্ধে বলে এসেছেন আর ইঞ্জিলেও লেখা আছে। অতএব এর অর্থ হলো, সেই বিশেষ মুহূর্তের খবর কারও জানা নেই। খোদা সর্বশক্তিমান। তিনি হাজার বছর অতিবাহিত হওয়ার পর কয়েক শতাব্দী বাড়িয়ে দিতে পারেন। কেননা ভগ্নাংশ গণনায় আসে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ গর্ভকাল অনেক সময় কিছুটা বেড়ে যায়। দেখ, অধিকাংশ শিশু যারা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে তাদের বেশির ভাগ নয় মাস দশ দিনে জন্ম নেয়। তা সত্ত্বেও বলা হয়, কখন প্রসব বেদনা আরম্ভ হবে সে মুহূর্তের সংবাদ কেউ রাখে না। অনুরূপভাবে পৃথিবী ধ্বংস হতে এখনও হাজার বছর বাকী কিন্ত কেউ জানে না কেয়ামত কোন মুহূর্তে ঘটে যাবে। খোদা ইমামত ও নবুয়তের সত্যতার জন্য যেসব প্রমাণ পেশ করেছেন সেগুলোকে নষ্ট করা নিজের ঈমানকে নষ্ট করার নামান্তর। স্পষ্টতঃই কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার লক্ষণাবলীও একত্র হয়ে গেছে। আর এ যুগে এক অসাধারণ বিপ্লবও দৃশ্যমান। কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার প্রমাণস্বরূপ আল্লাহ্ কুরআনে যেসব লক্ষণ বর্ণনা করেছেন এর অধিকাংশ প্রকাশিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কুরআন থেকে বুঝা যায়, কেয়ামতের সন্নিকটবর্তী যুগে ভূপৃষ্ঠে অগণিত নদ-নদী প্রবাহিত করা হবে, অজস্র বই ছাপা হবে, পাহাড় উড়িয়ে দেয়া হবে, নদী শুকিয়ে ফেলা হবে, ব্যাপক ভূখন্ড কৃষির অধীনে আসবে, যোগাযোগের পথ সুগম হবে, বিভিন্ন জাতির মাঝে ধর্মীয় বিবাদ-বিসম্বাদ বৃদ্ধি পাবে, এক জাতি অন্য জাতির ধর্মের ওপর ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়বে যেন একে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। সে সময় আসমানী শিঙ্গা নিজের কাজ দেখাবে। সকল

জাতি এক ধর্মে একত্র হবে। শুধু সেসব প্রত্যাখ্যাত লোক ছাড়া যারা স্বর্গীয় আমন্ত্রণের যোগ্য নয়। কুরআনে লিখিত এ সংবাদ আসলে মসীহ্ মাওউদ- এর আগমনের দিকে ইঙ্গিত করছে। আর এ কারণেই ইয়াজুজ মাজুজ প্রসঙ্গে এটি উল্লেখ করা হয়েছে। ইয়াজুজ মাজুজ দুটো জাতি। এদের কথা পূর্বের কিতাবেও লেখা আছে। এ নাম রাখার কারণ হলো, সে আজীজ বা অগ্নি দ্বারা অনেক কার্য সাধন করবে। ধরা পৃষ্ঠে তার ব্যাপক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সে সব প্রতিপত্তির অধিকারী হবে। যে যুগে স্বর্গ থেকে একটি বড় পরিবর্তনের ব্যবস্থা হবে। মীমাংসা ও শান্তির যুগের সূচনা হবে। অনুরূপভাবে কুরআন শরীফে লেখা আছে, সে যুগে মাটি থেকে অনেক খনিজ সম্পদ এবং গুপ্তধন বের হবে, তখন আকাশে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হবে, আর ধরাপৃষ্ঠে প্লেগের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ঘটবে এবং উট বেকার হয়ে যাবে, অর্থাৎ আর একটি ভ্রমণ-মাধ্যম আবিষ্কার হবে যা উটকে বেকার করে দেব। আমরা জানি যেসব ব্যবসা-বাণিজ্য পূর্বে উটের মাধ্যমে চলতো এখন রেল গাড়ীর মাধ্যমে হচ্ছে। সে যুগও সন্নিকটে যখন হজ্জ যাত্রীরাও রেল গাড়ীতে মদীনা মুনাওয়ারার দিকে সফর করবে। এ দিন সে হাদীসকে পূর্ণ করবে যাতে লেখা আছে যে,

و يترك القلاص فلا يسعى عليها

এসব যেহেতু শেষ যুগের জন্য নির্ধারিত লক্ষণাবলী যা পুরোপুরি প্রকাশিত হয়েছে, সেহেতু প্রমাণিত হলো যে, পৃথিবীর কালের ধারাবাহিকতায় এটি শেষকাল। তাছাড়া যেভাবে খোদা সাতদিন সৃষ্টি করেছেন আর প্রত্যেক দিনকে সহস্র বছরের সাথে তুলনা করেছেন এ তুলনার মাধ্যমে পৃথিবীর বয়স যে সাত হাজার বছর তা কুরআনের ভাষ্য থেকে প্রমাণিত। অধিকন্তু খোদা স্বয়ং বেজোড় এবং বেজোড়কে পছন্দ করেন। তিনি যেভাবে সাত দিন বেজোড় সৃষ্টি করেছেন অনুরূপভাবে সাত হাজারও বেজোড়। এসব কারণে বুঝা যায়, এটাই শেষ যুগ এবং পৃথিবীর শেষকাল। এর শিরোভাগে **মসীহ্ মাওউদ-এর আবির্ভূত হওয়া ঐশী কিতাব থেকে প্রমাণিত। তাছাড়া নবাব সিদ্দীক হাসান খাঁ সাহেব তাঁর বই 'হুজাজুল কেরামায়' সাক্ষ্য দিয়েছেন যে,** ইসলামের যত দিব্য-দর্শনে অভিজ্ঞ ব্যক্তি অতিবাহিত হয়েছেন তাঁদের কেউই মসীহ্ মাওউদ-এর যুগ নির্ধারণের ক্ষেত্রে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগকে অতিক্রম করেন নি।

এখন এখানে সহজাতভাবে প্রশ্ন দাঁড়ায়, মসীহ্ মাওউদকে এ উম্মত থেকে সৃষ্টি করার কী প্রয়োজন ছিল? এর উত্তর হলো- আল্লাহ্ তাআলা কুরআন শরীফে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, আঁ হযরত (সা.) তাঁর নবুয়তের প্রথম ও শেষ যুগের নিরিখে হযরত মূসা (আ.)-এর সদৃশ হবেন। সেই সাদৃশ্যগুলোর একটি প্রথম যুগে তথা আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে ছিল আর অন্যটি শেষ যুগে। সুতরাং প্রথম প্রমাণিত সাদৃশ্য হলো যেভাবে হযরত মূসা (আ.)-কে খোদা চূড়ান্ত পর্যায়ে ফেরআউন এবং তার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয় দান করেছিলেন, অনুরূপভাবে আঁ হযরত (সা.)-কেও অবশেষে সে যুগের ফেরআউন, আবূ জাহল ও তাদের বাহিনীদের বিরুদ্ধে যেন বিজয় দান করেন এবং তাদের সবাইকে ধ্বংস করে ইসলামকে আরব উপদ্বীপে প্রতিষ্ঠা করেন। সেই ঐশী সাহায্যের মাধ্যমে এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে যে,

اِنَّآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا ۥ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا

(সূরা মুযযাম্মিল, 73:16)

আর শেষ যুগের সাথে সাদৃশ্য হলো, খোদাতাআলা মূসায়ী মিল্লতের শেষ যুগে এমন একজন নবী প্রেরণ করেছেন যিনি জেহাদের বিরোধী ছিলেন এবং ধর্মীয় যুদ্ধের সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। মার্জনা ও ক্ষমা ছিল তাঁর শিক্ষা। তিনি এমন সময়ে এসেছিলেন যখন বনী ইসরাঈলের নৈতিক অবস্থা অনেক অধঃপতিত ছিল, তাদের আচার-আচরণে অনেক ক্রটি-বিচ্যুতি স্থান করে নিয়েছিল। তাদের রাজত্ব হাতছাড়া হতে থাকে এবং তারা রোমান রাজত্বের অধীনস্থ ছিল। হযরত মূসার পর ঠিক চতুর্দশ শতাব্দীতে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর মাধ্যমে ইসরাঈলী ধারার নবুয়তের সমাপ্তি ঘটে এবং তিনি ছিলেন ইসরাঈলী নবুয়তের শেষ ইট। অনুরূপভাবে আঁ হযরত (সা.)-এর উম্মতের শেষ যুগে মসীহ ইবনে মরিয়মের রং ও বৈশিষ্ট্যে এ লেখককে প্রেরণ করেছেন এবং আমার যুগে জেহাদের প্রথাকে উঠিয়ে দিয়েছেন। পূর্বেই সংবাদ দেয়া হয়েছিল, মসীহ মাওউদ-এর যুগে জেহাদ উঠিয়ে দেয়া হবে। অনুরূপভাবে আমাকে মার্জনা ও ক্ষমার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তাছাড়া আমি এমন সময়ে এসেছি যখন অধিকাংশ মুসলমানের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ইহুদীদের ন্যায় বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আধ্যাত্মিকতা লোপ

পেয়ে শুধু কুসংস্কারাদি এবং প্রথাপূজা তাদের ভিতর অবশিষ্ট থেকে যায়। কুরআন শরীফে এ সকল বিষয়ের প্রতি পূর্বেই ইঙ্গিত করা হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ এস্থানে শেষ যুগের মুসলমানদের জন্য কুরআন শরীফ সে শব্দ ব্যবহার করেছে যা ইহুদীদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন, فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ (সূরা আল্ আ'রাফ **7:130**) যার অর্থ হলো, তোমাদেরকে খিলাফত এবং রাজত্ব দেওয়া হবে কিন্তু শেষ যুগে তোমাদের অপকর্মের কারণে সে রাজত্ব তোমাদের হাত থেকে সেভাবে ছিনিয়ে নেওয়া হবে যেভাবে ইহুদীদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তারপর সূরা নূরে স্পষ্ট ইঙ্গিত করেন, যে যে বৈশিষ্ট্যের খলীফা বনী ইসরাঈলে অতীত হয়েছেন সেসব বৈশিষ্ট্য এ উম্মতের খলীফাদের থাকবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইসরাঈলী খলীফাদের ভিতর হযরত ঈসা (আ.) এমন খলীফা ছিলেন যিনি তলোয়ারও উঠান নি আর জেহাদও করেন নি। সুতরাং এ উম্মতকেও একই ধরনের মসীহ্ মাওউদ দেওয়া হয়েছে। দেখ,

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا
اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ
وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ
ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

(সূরা নূর, **24: 56**)

এ আয়াতে বাক্য كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ প্রণিধানযোগ্য। কেননা এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, মুহাম্মদী খিলাফতের ধারা মূসা (আ.)-এর খিলাফতের অনুরূপ। মূসায়ী খিলাফতের পরিসমাপ্তি যেহেতু এমন নবীর মাধ্যমে অর্থাৎ ঈসা (আ.)এর মাধ্যমে হয়েছে যিনি হযরত মূসা (আ.)-এর পর চতুর্দশ শতাব্দীর মাথায় এসেছিলেন এবং কোন যুদ্ধ ও জেহাদ করেন নি, তাই মুহাম্মদী সিলসিলার শেষ খলীফাকেও অনুরূপ মহিমাসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক ছিল।

একইভাবে সহী হাদীসেও উল্লেখ ছিল, শেষ যুগে মুসলমানদের অধিকাংশ ইহুদীদের

ন্যায় হয়ে যাবে। **সূরা ফাতিহাতেও** এ দিকেই ইঙ্গিত ছিল। কেননা তাতে এ দোয়া শিখানো হয়েছে, হে খোদা! আমাদেরকে এমন ইহুদী হওয়া থেকে রক্ষা কর যারা হযরত ঈসা (আ.)-এর সময় ছিল এবং তাঁর বিরোধী ছিল। যাদের ওপর এ পৃথিবীতেই আল্লাহ্‌র ক্রোধ বর্ষিত হয়েছিল। এটি আল্লাহ্‌র রীতি যে, খোদাতাআলা যখন কোন জাতিকে কোন নির্দেশ দেন বা কোন দোয়া শিখান তখন এর অর্থ হলো তাদের কিছু লোক সেই পাপের শিকার হবে যা থেকে তাদেরকে বারণ করা হচ্ছে। সুতরাং আয়াত

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

(সূরা ফাতিহা 1:7)

এর অর্থ হলো সেসব ইহুদী যারা মূসার উম্মতের শেষ যুগে অর্থাৎ হযরত মসীহের যুগে হযরত মসীহ্‌কে গ্রহণ না করার কারণে আল্লাহ্‌র ক্রোধভাজন হয়েছিল। এ আয়াতে উল্লিখিত সুন্নত অনুসারে এ ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, শেষ যুগে এ উম্মত হতে মসীহ্ মাওউদ আবির্ভূত হবেন। আর কিছু মুসলমান বিরোধিতা করে সেসব ইহুদীদের সাথে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করবে যারা হযরত ঈসার সময়ে ছিল। আগত মসীহ্ এ উম্মত থেকে হলে তাঁর নাম হাদীসে ঈসা কেন রাখা হলো এ আপত্তির কোন স্থান নেই। যেহেতু এটি আল্লাহ্‌র রীতি, কাউকে কাউকে অন্য নাম দেওয়া হয়ে থাকে, যেমন হাদীসে আবু জাহলের নাম ফেরআউন এবং হযরত নূহ (আ.)-এর নাম দ্বিতীয় আদম রাখা হয়েছিল আর ইয়াহিয়ার নাম রাখা হয়েছিল এলিয়া। এটি সেই ঐশী রীতি যা কেউ অস্বীকার করবে না। তাছাড়া খোদাতাআলা আগত মসীহের পূর্বের মসীহের সাথে এ সামঞ্জস্যও রেখেছেন যে, **প্রথম মসীহ্** অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছেন। একইভাবে **শেষ মসীহ্** আঁ হযরত (সা.)-এর পরে চতুর্দশ শতাব্দীতে এমন সময়ে এসেছেন যখন ভারত থেকে ইসলামী রাজত্ব হারিয়ে যেতে থাকে এবং ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি স্পষ্ট যে, হযরত মসীহ্ (আ.)-ও এমন সময় এসেছেন যখন ইসরাঈলী রাজত্ব অধঃমুখী হয়ে ইহুদীরা রোমান রাজত্বের অধীনস্থ হয়ে যায়। হযরত ঈসার সাথে এ উম্মতের মসীহ্ মাওউদের আর একটি সাদৃশ্য রয়েছে, তা হলো হযরত ঈসা (আ.)

পুরোপুরি বনী ইসরাঈলী ছিলেন না, বরং শুধু মায়ের কারণে তিনি ইসরাঈলী অভিহিত হন। অনুরূপভাবে এ অধমের কোন কোন দাদী সৈয়দ বংশোদ্ভূত, যদিও পিতা সৈয়দ বংশোদ্ভূত ছিলেন না। তাছাড়া কোন ইসরাঈলী হযরত ঈসার পিতা ছিলেন না। হযরত ঈসার জন্য খোদার এটি পছন্দ করার পিছনে একটি রহস্য ছিল। তা হলো খোদাতাআলা নবী ইসরাঈলের পাপাধিক্যের কারণে তাদের প্রতি একান্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাই সাবধানকারীস্বরূপ তাদেরকে এ নিদর্শন দেখালেন এবং তাদের থেকে পিতার কোন ভূমিকা ছাড়া শুধু মায়ের মাধ্যমে এক সন্তানের জন্ম দেন যেন ইসরাঈলী সত্তার দুই অংশের শুধু এক অংশ মসীহের নিকট থেকে গেল। এটি এ কথার দিকে ইঙ্গিত ছিল যে, আগত নবীর ভিতর এটিও অবশিষ্ট থাকবে না। সুতরাং পৃথিবী যেহেতু বিলুপ্তির দিকে তাই আমার এ জন্মেও একটি ইঙ্গিত রয়েছে আর তা হলো কিয়ামত সন্নিকটে এবং এটাই কুরায়েশের খিলাফতের প্রতিশ্রুতির অবসান ঘটাবে। বস্তুত মূসায়ী ও মুহাম্মদী সাদৃশ্যের পূর্ণতার জন্য এমন মসীহ্ মাওউদ আবশ্যক যার এ সমস্ত আবশ্যকীয় বিষয়াদিসহ আবির্ভূত হওয়া আবশ্যকীয় ছিল। যেভাবে ইসলামী সিলসিলাহ্ মসীলে মূসার মাধ্যমে আরম্ভ হয়েছিল, অনুরূপভাবে সেই সিলসিলা মসীলে ঈসার মাধ্যমে শেষ হওয়া বাঞ্ছনীয়, যেন সূচনার সাথে সমাপ্তির একটি সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়। সুতরাং এটিও আমার সত্যতার একটি প্রমাণ। কিন্তু এ শুধু তাদের জন্য যারা খোদাভীতির সাথে চিন্তা করে। খোদা এ যুগের মুসলমানদের ওপর দয়াপরবশ হোন। তাদের অধিকাংশ বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়াদি জুলুম এবং অন্যায়ের ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে গেছে। কুরআন শরীফে পড়ে যে, হজরত ঈসা (আ.) মারা গেছেন আবার তাঁকে জীবিতও মনে করে। অনুরূপভাবে **কুরআন শরীফে** সূরা নূরে পড়ে যে, আগত সব খলীফা এ উম্মত থেকে আসবেন তা সত্ত্বেও হযরত ঈসাকে আকাশ থেকে নামাচ্ছেন। **সহী বুখারী** এবং মুসলিমে পড়ে যে, সে ঈসা যিনি এ উম্মতের জন্য আসবেন। তিনি এ উম্মত থেকেই আসবেন তা সত্ত্বেও ইসরাঈলী ঈসার জন্য অপেক্ষমান। কুরআন শরীফে পড়ে, ঈসা পুনরায় পৃথিবীতে আসবেন না। এ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তাঁকে দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আনতে চায়। মুসলমান হওয়ার দাবী সত্ত্বেও বলে যে, হযরত ঈসা (আ.) জড়দেহসহ আকাশে জীবিত উত্থিত হয়েছেন। কিন্তু এ কথার উত্তর দেয় না যে, তিনি কেন উত্থিত হয়েছেন। ইহুদীদের বিতর্ক শুধু আধ্যাত্মিক **'রাফা'**

সম্পর্কে ছিল এবং তাদের ধারণা ছিল যে, ঈমানদারদের মত ঈসার আত্মা আকাশে উঠানো হয় নি, কেননা তাকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছে। যাকে ক্রুশে চড়ানো হয় সে অভিশপ্ত অর্থাৎ স্বর্গে আল্লাহর দিকে তার আত্মা উঠানো হয় না। কুরআন শরীফের শুধু এ বিবাদেরই মীমাংসা করার কথা ছিল। কুরআন যে দাবী করে তা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের ভ্রান্তিকে প্রকাশ করে এবং তাদের বিবাদের মীমাংসা করে। ইহুদীদের ঝগড়া যা নিয়ে ছিল তা হলো, ঈসা মসীহ্ ঈমানদার লোকদের অন্তর্ভূক্ত নন এবং তিনি পরিত্রাণ পান নি এবং তাঁর আত্মার খোদার দিকে 'রাফা' হয় নি। সুতরাং মীমাংসার বিষয় এটি ছিল যে, ঈসা মসীহ্ (আ.) ঈমানদার এবং খোদার সত্য নবী কিনা? মু'মিনদের মত খোদাতাআলার পানে তাঁর আত্মার 'রাফা' হয়েছে কি হয় নি? কুরআনের মীমাংসার বিষয় শুধু এটিই ছিল। সুতরাং بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ (সূরা নিসা, **4:159**) -এর অর্থ যদি এটি হয় যে, খোদাতাআলা হযরত ঈসা (আ.)-কে জড়দেহে দ্বিতীয় আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, এ কার্যের মাধ্যমে বিষয়টির কী নিষ্পত্তি হলো? যেন খোদাতাআলা বিতর্কিত বিষয়কে বুঝতেই পারলেন না, আর এমন সিদ্ধান্ত করেছেন ইহুদীদের দাবীর সাথে যার কোন সম্পর্কই নেই। তাছাড়া আয়াতে তো স্পষ্টভাবে লেখা হয়েছে যে, খোদার দিকে ঈসার 'রাফা' হয়েছে। এটি তো লেখা নেই যে, দ্বিতীয় আকাশের দিকে 'রাফা' হয়েছে। মহাপ্রতাপান্বিত খোদা কি দ্বিতীয় আকাশে বসে আছেন? বা মুক্তি ও ঈমানের জন্য দেহও কি সাথে উঠানো আবশ্যক? আর অদ্ভূত বিষয় হলো, بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ (সূরা নিসা, **4:159**) -তে আকাশের উল্লেখ নেই বরং এ আয়াতের একমাত্র অর্থ হলো, খোদা মসীহ্কে নিজের দিকে নিয়ে গেছেন। এখন বল, হযরত ইব্রাহীম (আ.), হযরত ইসমাঈল (আ.), হযরত ইসহাক (আ.), হযরত ইয়াকুব (আ.), হযরত মূসা (আ.) এবং আঁ হযরত (সা.)-কে কি নাউযুবিল্লাহ, আল্লাহর দিকে নয় অন্য কারো দিকে উঠানো হয়েছে? আমি এখানে বিশেষ জোর দিয়ে বলছি, بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ এ আয়াতকে হযরত মসীহের জন্য নির্দিষ্ট মনে করা অর্থাৎ رَفع اِلَی الله -কে তাঁর জন্য বিশেষ জ্ঞান করা আর অন্য নবীদেরকে এর বাইরে রাখা কুফরী বাক্য। এর তুলনায় বড় কুফরী নেই। কেননা এমন অর্থের মাধ্যমে হযরত ঈসা (আ.) ছাড়া সকল নবীদের 'রাফা' থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। অথচ আঁ

হযরত (সা.) মি’রাজ থেকে এসে তাঁদের ‘রাফা’র সাক্ষ্য দিয়েছেন। এ কথাও যেন স্মরণ থাকে যে, ঈসার ‘রাফা’র উল্লেখ শুধু ইহুদীদের সাবধান করা ও তাদের আপত্তি খণ্ডনের উদ্দেশ্যে ছিল। তাই জানা উচিত, এ ‘রাফা’ সব নবী, রসুল ও সকল মু’মিনের জন্য সমান। আর মৃত্যুর পর সকল মু’মিনের রাফা হয়। দেখুন-

هٰذَا ذِكْرٌ ۚ وَاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ - جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ

(সূরা সা’দ, **38:50-51**)

এ রাফার দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু কাফিরের ‘রাফা’ হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ (সূরা আ’রাফ, **7:41**) সেই দিকেই ইঙ্গিত করে। অবশ্য যারা আমার পূর্বে এ বিষয়ে ভুল করেছে তাদের সেই ভুল মার্জনীয়। কেননা তাদেরকে স্মরণ করানো হয় নি। তাদেরকে খোদার কথার সত্যিকার অর্থ বুঝানো হয় নি। কিন্তু আমি তোমাদের স্মরণ করিয়েছি আর যথাযথ অর্থ বুঝিয়েছি। আমি না আসলে প্রচলিত বিশ্বাসের অন্ধ অনুকরণ ভুলের জন্য বাহানা হতে পারতো। কিন্তু এখন কোন অজুহাত অবশিষ্ট্য নেই। আমার জন্য আকাশও সাক্ষ্য দিয়েছে আর জমীনও। অধিকন্ত এ উম্মতের কোন কোন আওলিয়া আমার নাম এবং বাসস্থানের নাম উল্লেখ করে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, ইনিই সেই মসীহ্ মাওউদ। অনেক সাক্ষ্যদাতা আমার আবির্ভাবের ৩০ বছর পূর্বে পৃথিবী থেকে চলে গেছেন। আমি ইতিমধ্যেই তাঁদের সাক্ষ্য ছাপিয়ে দিয়েছি। তাছাড়া এ যুগে কোন কোন বুযুর্গানে দ্বীন যাদের লক্ষ লক্ষ অনুসারী ছিল, খোদার পক্ষ থেকে ইলহাম পেয়ে এবং স্বপ্নে আঁ হযরতের (সা.) কাছ থেকে শুনে আমার সত্যায়ন করেছেন। এখন পর্যন্ত সহস্র সহস্র নিদর্শন আমার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। আর খোদার পবিত্র নবীরা আমার সময় এবং যুগ নির্ধারণ করেছেন। তোমরা চিন্তা করলে দেখবে তোমাদের হাত, পা, তোমাদের হৃদয়ও আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে। কেননা দুর্বলতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে আর অধিকাংশ মানুষ ঈমানের স্বাদও ভুলে

গেছে। আর যে অক্ষমতা ও দুর্বলতা, যে ভ্রান্তি, পথ-ভ্রষ্টতা, বস্তুবাদিতা এবং অন্ধকারে এ জাতি বন্দী হচ্ছে সে অবস্থা স্বভাবতঃই হাতছানি দিয়ে বলছে, কেউ আসুক আর তাদের সাহায্য করুক। এতদ্‌সত্ত্বেও এখনো আমাকে ‘দাজ্জাল’ আখ্যায়িত করা হয়। সে জাতি কত দুর্ভাগা, যাদের এহেন নাজুক অবস্থায় তাদের জন্য ‘দাজ্জাল’ পাঠানো হয়। সে জাতি কত দুর্ভাগা, যাদের অভ্যন্তরীণ ধ্বংসের যুগে আকাশ থেকে আর একটি ধ্বংস প্রেরণ করা হয়। তারা বলে, এ ব্যক্তি অভিশপ্ত, বেঈমান। একই কথা হযরত ঈসা (আ.)-কেও বলা হয়েছে আর অপবিত্র ইহুদীরা তা এখনও বলে। কিন্তু কিয়ামতে যারা জাহান্নামের স্বাদ গ্রহণ করবে তারা বলবে -

مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ

(সূরা সা’দ, **38:63**)

অর্থাৎ আমাদের কী হয়েছে যে, দোযখে আমরা সেসব লোকদেরকে দেখি না যাদেরকে আমরা দুষ্কৃতিপরায়ণ মনে করতাম। পৃথিবী সবসময় খোদার মা’মুরদের সাথে শত্রুতা করেছে। কেননা ইহজগতকে ভালবাসা এবং আল্লাহর প্রেরিতদের ভালবাসা আদৌ একস্থানে একত্র হতে পারে না। যদি তোমরা ইহজগতকে ভাল না বাসতে তাহলে আমাকে দেখতে পেতে, কিন্তু এখন তোমরা আমাকে দেখতে সক্ষম নও।

অধিকন্তু এ কথা যদি সঠিক হয় অর্থাৎ بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ (সূরা নিসা ঃ ১৫৯) - এর অর্থ যদি এটি হয় যে, হযরত ঈসা (আ.) দ্বিতীয় আকাশের দিকে উত্থিত হয়েছেন তা হলে আসল বিতর্কিত বিষয়ের সিদ্ধান্ত কোন্ আয়াতে দেওয়া হয়েছে তা দেখানো উচিত। যে সব ইহুদী আজ পর্যন্ত জীবিত ও বর্তমান রয়েছে তারা হযরত ঈসা (আ.)-এর ‘রাফা’ এ অর্থে অস্বীকার করে যে, তিনি নাঊযুবিল্লাহ্ মু’মিন এবং সাদেক ছিলেন না এবং খোদার দিকে তার আত্মার ‘রাফা’ হয় নি। যদি সন্দেহ থাকে তাহলে ইহুদীদের আলেমদেরকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর। তারা ক্রুশীয় মৃত্যুর এ অর্থ করে না যে, সেই মৃত্যুর কারণে আত্মা দেহসহ আকাশে যায় না, বরং তারা সর্বসম্মতভাবে একথা বলে, যে ব্যক্তি ক্রুশে মারা যায় সে অভিশপ্ত। খোদার দিকে তার ‘রাফা’ হতে পারে না। এ কারণেই আল্লাহ্ তাআলা

কুরআন শরীফে হযরত ঈসা (আ.)-এর ক্রুশীয় মৃত্যুকে অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন,

وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ

(সূরা নিসা, **4:158**)

আর 'সালাবুহু'র সাথে আয়াতে 'কাতালুহু' শব্দ যোগ করেছেন যেন এ কথা প্রমাণ হয় যে, শুধু ক্রুশে চড়ানো অভিশাপের কারণ নয় বরং শর্ত হলো ক্রুশে চড়াতে হবে আর হত্যার উদ্দেশ্যে তার পা-ও ভাঙ্গতে এবং তাকে হত্যাও করতে হবে। শুধু তখনই সেই মৃত্যু অভিশপ্ত মৃত্যু আখ্যা পাবে। কিন্তু খোদা ঈসাকে সে মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছেন। তাঁকে ক্রুশে চড়ানো হয়েছে, কিন্তু ক্রুশের মাধ্যমে তাঁর মৃত্যু হয় নি। অবশ্য ইহুদীদের হৃদয়ে এ সন্দেহ সৃষ্টি করা হয়েছিল যে, তিনি হয়ত ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছেন। খ্রীষ্টানেরাও একই প্রতারণার শিকার হয়েছে। তারা অবশ্য ভেবেছে যে, তিনি মৃত্যুর পর জীবিত হয়ে গেছেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা শুধু এটিই ছিল যে, তিনি সেই ক্রুশের বেদনায় চেতনা হারিয়ে ফেলেন। شُبِّهَ لَهُمْ এর এটিই অর্থ। ঈসার মলমের ব্যবস্থাপত্র এ ঘটনা সম্পর্কে এক আশ্চর্যজনক সাক্ষ্য শত শত বছর ধরে ইব্রানী, রুমী, ইউনানী এবং মুসলমানদের চিকিৎসা শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়ে আসছে, যার সংজ্ঞায় তাঁরা লেখেন, হযরত ঈসার জন্য এ ঔষধ প্রস্তুত করা হয়েছিল। বস্তুত হযরত ঈসাকে খোদাতাআলা সশরীরে আকাশে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন, এ ধারণা একান্ত লজ্জার। যেন তিনি ভয় পেতেন, পাছে কোথাও ইহুদীরা ধরে না ফেলে। যারা আসল বিতর্ক সম্পর্কে অবহিত ছিল না তারা এমন ধারণা ছড়িয়েছে। এমন ধারণা আঁ হযরত (সা.)-এর অসম্মান, কেননা তাঁর কাছে মক্কার কুরাইশরা এ নিদর্শনের জন্য জোর দাবি জানিয়েছিল যে, আপনি আমাদের চোখের সামনে আকাশে আরোহণ করুন এবং কিতাব নিয়ে আকাশ থেকে অবতরণ করুন, তাহলে আমরা সবাই ঈমান আনব। তারা এ উত্তর পেয়েছে যে,

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا

(সূরা বনী ইসরাঈল, **17:94**)

অর্থাৎ আমি একজন মানুষ, আর খোদাতাআলা প্রতিশ্রুতির ব্যত্যয় ঘটিয়ে কোন মানুষকে আকাশে উঠানোর উর্দ্ধে। কেননা তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সব মানুষ ধরাতেই জীবন যাপন করবে। কিন্তু হযরত মসীহ্‌কে খোদা সশরীরে আকাশে উঠিয়েছেন আর এ প্রতিশ্রুতির প্রতি আদৌ ভ্রুক্ষেপ করলেন না! যেমন, তিনি বলেছেন,

فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ

(সূরা আ'রাফ, 7:26)

অনেকেই মনে করে আমাদের কোন মসীহ্ মাওউদকে মানার প্রয়োজন নেই। তারা আরও বলে যদিও আমরা মানলাম যে, হযরত ঈসা (আ.) মারা গেছেন, কিন্তু আমরা যেহেতু মুসলমান, নামায পড়ি, রোযা রাখি এবং ইসলামের আদেশ-নিষেধ মেনে চলি, আমাদের অন্য কোন ব্যক্তির প্রয়োজনই বা কী? কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত, এমন ধারণার বশবর্তী ব্যক্তিরা মারাত্মক ভ্রান্তিতে রয়েছে। প্রধানতঃ খোদা ও রসুলের নির্দেশকে না মেনে তারা মুসলমান হওয়ার দাবী কীভাবে করতে পারে? এটাই নির্দেশ ছিল যে, যখন সেই প্রতিশ্রুত ইমাম আবির্ভূত হবেন তোমরা কাল ক্ষেপণ না করে তার দিকে ছুটো, আর বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়েও যদি চলতে হয় তবু তার কাছে পৌঁছাও। কিন্তু এখন তাঁর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়। এ কি ইসলাম? আর এ কি মুসলমানীত্ব? শুধু তাই নয় বরং কঠোর গালি দেওয়া হয়, কাফির বলা হয় এবং দাজ্জাল নাম রাখা হয়। যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দেয় সে মনে করে, আমি বড় পুণ্যের কাজ করেছি। আর যে আমাকে মিথ্যাবাদী বলে বেড়ায় সে মনে করে আমি আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করলাম।

হে লোকসকল! তোমাদের তো ধৈর্য ও খোদাভীতির শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, তোমাদেরকে তাড়াহুড়ো করার এবং কুধারণা করা কে শিখিয়েছে? এমন কোন্ নিদর্শন আছে কি যা খোদা প্রকাশ করেন নি? আর কোন প্রমাণ আছে যা খোদা পেশ করেন নি? কিন্তু তোমরা গ্রহণ কর নি? আর এমন খোদার নির্দেশাবলীকে ধৃষ্টতার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছো। আমি এ যুগের চক্রান্তকারী লোকদেরকে কার সাথে তুলনা করবো? তারা সেই কুচক্রীর সদৃশ যে আলোকোদ্ভাসিত দিবসে চোখ বন্ধ রেখে বলে, সূর্য কোথায়? হে আত্মপ্রতারক! প্রথমে নিজের

চোখ খোল। তারপর তুমি সূর্যকে দেখতে পাবে। খোদার প্রেরিতকে কাফির বলা সহজ, কিন্তু ঈমানের সূক্ষ্ম পথে তাঁর অনুসরণ করা কঠিন বিষয়। আল্লাহ্ মনোনীত ব্যক্তিকে 'দাজ্জাল' বলা বড় সহজ কিন্তু তাঁর শিক্ষানুসারে সংকীর্ণ দ্বারে প্রবেশ করা খুবই কঠিন বিষয়। প্রত্যেক ব্যক্তি যে বলে আমার মসীহ্ মাওউদ এর কোনই পরওয়া নেই আসলে তার ঈমানেরই কোন পরওয়া নেই। এমন মানুষ সত্যিকারের ঈমান, মুক্তি ও সত্যিকারের পবিত্রতা ব্যাপারে উদাসীন। যদি তারা কিছুটা ইনসাফ করে এবং নিজেদের অভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর দৃষ্টিপাত করে তাহলে বুঝবে, খোদার প্রেরিতগণ ও নবীদের মাধ্যমে আকাশ থেকে যে তাজা ঈমান নাযেল হয় তা ছাড়া তাদের নামায শুধু প্রথা ও অভ্যাসগত নামায এবং তাদের রোযা শুধু অনাহার ও উপবাস যাপন। আসল কথা হলো, কোন মানুষ সত্যিকার অর্থে পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারে না এবং প্রকৃতার্থে খোদাতাআলাকে ভালবাসতে পারে না বা তাঁকে যথার্থভাবে ভয় করতে সক্ষম নয় যদি তাঁর অনুগ্রহ ও দয়া, তাঁর মা'রেফত বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হয় এবং তাঁর পক্ষ থেকে শক্তি লাভ না হয়। আর এ কথা একান্ত স্পষ্ট যে, প্রত্যেক ভয় এবং ভালবাসা অন্তর্দৃষ্টির ফলেই সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর সব বস্তু যার প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয় ও ভালবাসে বা ভয় করে এবং এড়িয়ে চলে, এ সমুদয় অবস্থা মানুষের হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভের পরেই সৃষ্টি হয়। আর এটিও সত্য, তত্ত্ব-জ্ঞান খোদার অনুগ্রহ ছাড়া লাভ করা সম্ভব নয়। আর যতক্ষণ খোদাতাআলার অনুগ্রহ না হয় এগুলো কল্যাণকরও হয় না। বস্তুত অতঃপর এশী তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে সত্য এবং সঠিক পথের দরজা উন্মুক্ত হয় যা কখনও অবরুদ্ধ হয় না। তত্ত্ব-জ্ঞান আশিসের দ্বারাই স্থায়ী হয়। ফযল অন্তর্দৃষ্টিকে অত্যন্ত স্বচ্ছ ও দীপ্তিমান করে তোলে আর মাঝ থেকে পর্দা অপসারণ করে এবং অবাধ্য আত্মার কলুষতাকে দূর করে দেয়, আত্মাকে শক্তি ও প্রাণসঞ্চার করতঃ অবাধ্য-আত্মাকে অবাধ্যতার বন্দীদশা থেকে বের করে এবং নোংরা কামনা-বাসনার নোংরামী থেকে পবিত্র করে ও অনিয়ন্ত্রিত আবেগের প্রবল বন্যা থেকে বাইরে নিয়ে আসে। তখন মানুষের মাঝে একটি পরিবর্তন সৃষ্টি হয়, ফলে সে নোংরা জীবনের প্রতি সহজাতভাবে বিমুখ হয়ে যায়।

এরপর আশিসের কারণে হৃদয়ে যে প্রথম প্রেরণা সৃষ্টি হয় তা হলো দোয়া। এ

কথা মনে করো না, আমরাও প্রত্যেকদিন দোয়া করি এবং সব নামায যা আমরা পড়ি সেগুলোইতো দোয়া। কেননা, সেই দোয়া যা অন্তর্দৃষ্টি লাভের পর আশিসের মাধ্যমে উদ্ভূত হয় এর রং ও অবস্থাই ভিন্ন। সেটি ফানাকারী (অর্থাৎ বিলীনকারী) বিষয়। এটা দাহিকাসম্বলিত এক অগ্নি, রহমতকে আকর্ষণকারী এক চুম্বনীয় আকর্ষণ। এটা এক মৃত্যু, কিন্তু অবশেষে এক জীবন দান করে। এটা এক প্রবল বন্যা কিন্তু অবশেষে নৌকা তৈরী হয়ে যায়। সব বিশৃঙ্খল বিষয় এর মাধ্যমে সুবিন্যস্ত হয়। সব বিষ এক পর্যায়ে এতদ্‌দ্বারা প্রতিষেধক হয়ে যায়।

সৌভাগ্যবান সেই বন্দী যিনি দোয়া করে ক্লান্ত হন না। কেননা তিনি একদিন মুক্তি পাবেনই। বরকতময় সেসব অন্ধ যারা দোয়াতে আলস্য দেখান না। কেননা, একদিন দৃষ্টি লাভ করবেন। সৌভাগ্যবান তারা যারা কবরে পতিত অবস্থায় দোয়ার মাধ্যমে খোদার সাহায্য চান। কেননা একদিন কবর থেকে বের হবেন।

কখনও যদি তোমরা দোয়ার ব্যাপারে ক্লান্তি না দেখাও; তোমাদের আত্মা যদি দোয়ার জন্য বিগলিত হয় ও তোমাদের চোখ অশ্রু বিসর্জন করে, তোমাদের বক্ষে এক প্রকারের আগুন লাগে, নির্জনতার স্বাদ উপভোগের জন্য তোমাদেরকে অন্ধকার ঘরে আর জন-মানবশূন্য জঙ্গলে নিয়ে যায়; তোমাদেরকে ব্যাকুল ও পাগল করে তোলে এবং তোমাদের মাঝে একটি গতি সৃষ্টি করে আর তোমাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দেয় তাহলে তোমরা সৌভাগ্যবান। কেননা, পরিশেষে তোমাদের উপর আশিস বর্ষণ করা হবে। সেই খোদা যাঁর দিকে আমরা আহ্বান করি তিনি একান্ত সম্মানিত, দয়ালু, লজ্জাশীল, সত্যবাদী, বিশ্বস্ত ও বিনয়ীদের প্রতি দয়ার্দ্র। সুতরাং তোমরাও বিশ্বস্ত হয়ে যাও। পুরো আন্তরিকতা এবং বিশ্বস্ততার সাথে দোয়া কর। ফলশ্রুতিতে তিনিও তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। এ পৃথিবীর হট্টগোল থেকে পৃথক হয়ে যাও। কুপ্ররোচনার ঝগড়া দিয়ে ধর্মকে প্রভাবিত করো না। আল্লাহর জন্য হার মেনে নাও এবং পরাজয় স্বীকার কর। ফলশ্রুতিতে তোমরা বড় বড় সফলতার উত্তরাধিকারী হবে। খোদা দোয়াকারীদের নিদর্শন দেখাবেন এবং প্রার্থনাকারীদেরকে একটি অসাধারণ নেয়ামত দেওয়া হবে। খোদার পক্ষ থেকে দোয়া আসে আর খোদার দিকেই যায়। দোয়ার ফলে খোদা সেভাবে কাছে এসে যান যেমনটি মানুষের প্রাণ

মানুষের কাছে। দোয়ার প্রথম পুরস্কারস্বরূপ মানুষের ভিতর পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। সেই পরিবর্তন অনুসারে খোদাও স্বীয় বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন আনয়ন করেন। তাঁর গুণাবলী অপরিবর্তনীয়; কিন্তু পরিবর্তিত লোকদের জন্য তাঁর একটি ভিন্ন বিকাশ ঘটে যা পৃথিবী জানে না। তিনি যেন ভিন্ন খোদা অথচ তিনি ভিন্ন খোদা নন। কিন্তু জ্যোতির্বিকাশ তাঁকে নতুন রঙে প্রকাশ করে। তখন তিনি সে বিকাশের মহিমায় পরিবর্তিত ব্যক্তির জন্য সেই কাজ করেন যা অন্যদের জন্য করেন না। এটিই সেই অসাধারণ বিষয়।

মোটকথা দোয়া সেই মহৌষধ যা এক মুষ্ঠি ধূলোকে স্বর্ণ বানিয়ে দেয় এবং এটা এক প্রকার পানি যা অভ্যন্তরীণ আবর্জনাকে ধুয়ে ফেলে। সেই দোয়ার মাধ্যমে রূহ বিগলিত হয় এবং পানির মত প্রবাহিত হয়ে আল্লাহ্‌র আস্তানায় পতিত হয়। এ খোদার সন্নিধানে দাঁড়ায় এবং রুকু ও সিজদা করে। একই প্রতিচ্ছবি সেই নামায যা ইসলাম শিখিয়েছে। রূহের দন্ডায়মান হওয়ার এ অর্থ যে, খোদার জন্য সব দাপটকে সহ্য করে এবং সব নির্দেশকে মানার জন্য সদা প্রস্তুত বলে। এর রুকু তথা ঝুঁকা হলো এসব ভালবাসা এবং সম্পর্ককে ছিন্ন করে খোদার দিকে ঝুঁকে এবং খোদার হয়ে যায়। এর সিজদা হলো খোদার আস্তানায় পড়ে সম্পূর্ণভাবে আত্মবিস্মৃত হয়ে যায় এবং স্বীয় সত্তার ছাপকে মিটিয়ে দেয়। এটিই সত্যিকারের নামায যা খোদা লাভের মাধ্যম। ইসলামী শরীয়ত এর ছবি সাধারণ নামাযে অংকন করে দেখিয়েছে যেন দৈহিক নামায আধ্যাত্মিক নামাযের প্রেরণা যোগায়। এর কারণ হলো, খোদাতাআলা মানব-সত্তাকে এমন আকৃতি দিয়েছেন যেন দেহের উপর আত্মার এবং আত্মার উপর দেহের অবশ্যই প্রভাব পড়ে। তোমাদের আত্মা দুঃখিত হলে চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়। আর যখন আত্মা আনন্দিত হয় চেহারায় প্রফুল্লতা প্রকাশ পায়, এমনকি মানুষ কখনও হেসে উঠে। অনুরূপভাবে শরীর কোন কষ্ট বা ব্যথা পেলে সে ব্যথায় আত্মা অংশ গ্রহণ করে। যখন শরীর কোন সুশীতল বাতাসে পুলকিত হয় আত্মা তা থেকে অংশ পায়। সুতরাং দৈহিক ইবাদতের উদ্দেশ্য হলো আত্মা ও দেহের পারস্পরিক সম্পর্কের ফলশ্রুতিতে আত্মাকে আল্লাহ্‌র দিকে গতি সৃষ্টি করা এবং এ যেন আধ্যাত্মিক কিয়াম ও সিজদায় রত হয়ে যাওয়া। কেননা উন্নতির জন্য মানুষ সাধনার মুখাপেক্ষী আর এটিও এক ধরনের সাধনা। এটি স্পষ্ট কথা যে, সংযুক্ত

দুটো বস্তুর একটিকে আমরা যখন উঠাবো তখন অন্যটিতেও গতি সঞ্চার হবে। কিন্তু শুধু দৈহিক কিয়াম, রুকু বা সিজদায় কোন লাভ নেই; যতক্ষণ তার সাথে নিজের মতো করে কিয়াম, রুকু বা সিজদায় আত্মার অংশ নেয়ার চেষ্টা না হবে। আর এ অংশ নেওয়া অন্তর্দৃষ্টির উপর নির্ভর করে, আর অন্তর্দৃষ্টি আশিসের উপর নির্ভরশীল। খোদা আদি থেকে তথা যখন থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এ রীতি প্রবর্তন করেছেন যে, তিনি তাঁর মহান অনুগ্রহে যাকে চান, তার ওপর রূহুল কুদুস নাযেল করেন; তারপর রূহুল কুদুসের সাহায্যে এর মাঝে স্বীয় প্রেম সৃষ্টি করেন। আন্তরিকতা ও দৃঢ়চিত্ততা দান করেন। অগণিত নিদর্শনের মাধ্যমে এর অন্তর্দৃষ্টিকে প্রখর করেন এবং এর দুর্বলতাসমূহ দূরীভূত করেন। এমনকি সে সত্যিকার অর্থে তাঁর পথে প্রাণ বিসর্জন করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। তাঁর সেই অনাদি সত্তার সাথে এমন অটুট সম্পর্ক সৃষ্ট হয়ে যায় যে, কোন সমস্যা, বিপদ-আপদ এ সম্পর্কে দূরত্ব সৃষ্টি করতে পারে না এবং তরবারী এ সম্পর্ককে ছিন্ন করতে পারে না। তাছাড়া এ ভালবাসায় কোন ক্ষণস্থায়ী স্বার্থ থাকে না। জান্নাতের বাসনাও নয়, দোযখের ভয়ও নয়, বা দুনিয়ার স্বাচ্ছন্দ্যও নয়, কোন ধন-দৌলতও নয় বরং একটি অজানা সম্পর্ক থাকে যা শুধু আল্লাহতাআলাই জানেন। অদ্ভুত বিষয় হলো, এ প্রেমাসক্ত ব্যক্তিও এ সম্পর্কের গভীরে পৌঁছুতে পারে না, কেন কোন্ স্বার্থে এবং কীভাবে তা সৃষ্টি হলো? কেননা এ সম্পর্ক যে আদি থেকে বিদ্যমান। এ সম্পর্ক অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে অর্জিত নয় বরং অন্তর্দৃষ্টি পরে লাভ হয় যা এ সম্পর্ককে দীপ্তিমান করে। যেভাবে পাথরে অগ্নি তো আগে থেকেই রয়েছে অথচ চকমকি ঠোকার পলে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বের হওয়া আরম্ভ হয়ে যায়। এমন ব্যক্তির মাঝে একদিকে খোদাতাআলার নিজস্ব ভালবাসা থাকে অন্যদিকে মানব জাতির প্রতি সহমর্মিতা এবং সংশোধনের একটি অনুরাগ থাকে। সে কারণে একদিকে খোদার সাথে তার এমন যোগসূত্র থাকে যে, তিনি সদা তাঁর দিকে আকৃষ্ট হতে থাকেন। অপরদিকে মানব জাতির সাথেও তার এমন সম্পর্ক থাকে যা তার কার্যক্ষম প্রকৃতিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। যেভাবে সূর্য পৃথিবীর সকল স্তরের সৃষ্টিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করছে এবং সে নিজেও একদিকে আকৃষ্ট হচ্ছে, অনুরূপ অবস্থা সে ব্যক্তিরও হয়। ইসলামী পরিভাষায় এমন লোকদের নবী, রসূল ও মুহাদ্দেস বলা হয়। তাঁরা খোদার সাথে পবিত্র বাক্যালাপে সম্মানিত হন এবং তাঁদের মাধ্যমে অসাধ্য সাধন

হয়। তাঁদের অধিকাংশ দোয়া কবুল হয়। তাঁরা খোদাতাআলার পক্ষ থেকে তাঁদের দোয়ার অজস্র উত্তর পান। কিছু অজ্ঞ এখানে এ কথা বলে যে, আমরাও সত্য-স্বপ্ন দেখি, কোন সময় দোয়াও কবুল হয়- কোন সময় ইলহামও হয়। সুতরাং আমাদের এবং রসূলদের মাঝে পার্থক্য কী? সুতরাং তাদের মতে আল্লাহ্‌র নবী প্রতারক বা প্রতারিত, যে একটি সামান্য বিষয় নিয়ে অহঙ্কার করছে। আর তাঁদের এবং অন্যদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। এটি এমন অহঙ্কারসূচক ধারণা যার ফলে এ যুগে অনেক মানুষ ধ্বংস হচ্ছে, কিন্তু সত্যান্বেষীর জন্য এ ভুল ধারণার সুস্পষ্ট উত্তর আছে, আর তা হলো, এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, খোদাতাআলা স্বীয় বিশেষ আশিস এবং বদান্যতার এক শ্রেণীকে মনোনীত করে আধ্যাত্মিক নেয়ামতের বিরাট অংশ দিয়েছেন। তাই, যদিও এমনসব শত্রু ও অন্ধ নবীদের বিরোধিতা করে আসছে তা সত্ত্বেও খোদার নবীরা তাদের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হয়ে আসছেন এবং তাঁদের অসাধারণ জ্যোতিঃ সবসময় এমনভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে যে, চূড়ান্ত পর্যায়ে বিবেকবানদেরকে মানতে হয়েছে, তাঁদের মাঝে এবং অন্যদের মাঝে একটি বিরাট পার্থক্য আছে। এটি স্পষ্ট একটি বিষয় যে, একজন কপর্দকহীন ভিখারীর কাছেও কয়েকটি টাকা থেকে থাকে একইভাবে একজন রাজাধিরাজের ধনভাণ্ডারও টাকা-পয়সায় পরিপূর্ণ থাকে, কিন্তু সেই কপর্দকহীন বলতে পারে না যে, আমি বাদশার সমতুল্য। অথবা দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি পতঙ্গেও আলো থাকে যা রাতে জ্বল জ্বল করে, আর সূর্যেও আলো আছে, কিন্তু পতঙ্গ বলতে পারে না যে, আমি সূর্যের সমান। খোদা সাধারণ লোকদের আত্মায় যে রূইয়া, দিব্য-দর্শন ও ইলহামের কিছু বীজ বপন করেছেন এর কারণ হলো, এরা যেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নবীদের চিনতে পারে, আর এভাবে তাদের কাছে সত্য যেন স্পষ্ট হয়ে যায় আর কোন অজুহাত যেন অবশিষ্ট্য না থাকে।

খোদার মনোনীত বান্দাদের আর একটি বিশেষত্ব হলো, তাঁরা প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং আকর্ষণী শক্তির অধিকারী হয়ে থাকেন। তাঁরা পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক বংশধারা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরিত হন। যেহেতু তাঁরা অন্তর্দৃষ্টির আলোকে পথ প্রদর্শন করে থাকেন আর সৃষ্টির অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্দাকে মাঝ থেকে উঠিয়ে দেন; তাই সত্যিকারের ইলহামী মা'রেফত, সত্য ঐশী-প্রেম, সত্যিকারের বৈরাগ্য ও তাক্‌ওয়া এবং সত্যিকারের আধ্যাত্মিক আনন্দ ও প্রশান্তি তাঁদের মাধ্যমে

দিনের* মধ্যে সৃষ্টি হয়। তাঁদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা বৃক্ষের সাথে শাখার সম্পর্ক ছিন্ন করার মত বিষয়। আর এসব সম্পর্কে কিছু এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, সম্পর্ক স্থাপনের সাথে সাথে সামঞ্জস্য অনুসারে আধ্যাত্মিক উন্নতি হতে থাকে। সম্পর্ক ছিন্ন করার সাথে সাথে ঈমানী অবস্থার উপর ধূলোবালি জমে যায়। সুতরাং কোন ব্যক্তির এ কথা বলা যে, খোদার নবী ও রসূলের আমার কোন প্রয়োজন নেই- এটি একান্ত অহঙ্কারপূর্ণ ধারণা। এটি ঈমানহীনতার লক্ষণ। এমন ধারণার বশবর্তী ব্যক্তি নিজেকে প্রতারিত করে, অথচ সে বলে যে, আমি কি নামায পড়ি না? বা রোযা রাখি না? বা আমি কি কলেমা পড়ি না? যেহেতু সে সত্যিকারের ঈমান এবং সত্য-উদ্দীপনা সম্পর্কে অনবহিত তাই সে এমন কথা বলে। তার ভাবা উচিত, যদিও মানুষকে আল্লাহ্ তাআলাই সৃষ্টি করেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি মানুষকে অন্য মানুষের জন্মের কারণও করেছেন। যেভাবে জাগতিক বিধানে দৈহিক পিতা থেকে থাকেন যাদের মাধ্যমে মানুষের জন্ম হয়, অনুরূপভাবে রূহানী বিধানে আধ্যাত্মিক পিতাও থেকে থাকেন যাদের মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতার জন্ম হয়। সাবধান হও এবং ইসলামের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের নামে আত্মপ্রতারণায় মগ্ন হয়ো না। আর আল্লাহর কথাকে গভীর মনোযোগ সহকারে পড় যাতে বুঝতে পারো যে, তিনি তোমাদের কাছে কী চান? তিনি তোমাদের নিকট তা-ই চান যে সম্পর্কে সূরা ফাতিহায় তোমাদেরকে দোয়া শেখানো হয়েছে অর্থাৎ এই দোয়া;

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

(সূরা ফাতিহা **1:6-7**)

যেহেতু খোদা তোমাদেরকে এ জোরালো নির্দেশ দিচ্ছেন যে, পাঁচবার এ দোয়া কর যেন সেসব নেয়ামত তোমরাও পাও যা নবী ও রসূলগণ লাভ করেন। তাই তোমরা নবী ও রসূলদের মাধ্যম ছাড়া সে নেয়ামত কীভাবে পেতে পার? অতএব তোমাদেরকে বিশ্বাস ও প্রেমের স্তর পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য কখনো কখনো নবী

---

* লেখনী জনিত ত্রুটি। মূল শব্দটি “হৃদয়ে” হবে। -(প্রকাশক)

আসা আবশ্যক, যাঁদের মাধ্যমে তোমরা সেসব পুরস্কারপ্রাপ্ত হও। বল, তোমরা কি খোদার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং তাঁর আদি-রীতিকে ভঙ্গ করবে। শুক্রাণু কি বলতে পারে যে, আমি পিতার মাধ্যমে জন্ম নিতে চাই না। কান কি বলতে পারে আমরা বাতাসের মাধ্যমে শুনতে চাই না। আল্লাহ্‌র আদি নিয়মের উপর আক্রমণের চেয়ে বড় নির্বুদ্ধিতা আর কী হবে?

সবশেষে এ কথাটি স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, এ যুগে খোদার পক্ষ থেকে আমার আসা শুধু মুসলমানদের সংশোধনের জন্য নয় বরং মুসলমান, হিন্দু ও খ্রীষ্টান তিন জাতিরও সংশোধনের উদ্দেশ্য। যেভাবে খোদা আমাকে মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের জন্য **মসীহ্ মাওউদ** করে পাঠিয়েছেন অনুরূপভাবে আমি হিন্দুদের জন্য **অবতারস্বরূপ**। আমি বিশ বছর বা ততোধিককাল থেকে এ কথা প্রচার করে আসছি, যেসব পাপে পৃথিবী ভরে গেছে আমি তা দূর করার জন্য একদিকে যেমন মসীহ্ ইবনে মরিয়মের বৈশিষ্ট্যে এসেছি অপরপক্ষে রাজা কৃষ্ণের রঙেও আমি রঙীন। রাজা কৃষ্ণ হিন্দু ধর্মের অবতারদের মাঝে একজন বড় অবতার ছিলেন। উপরোক্ত কথাটি এভাবে বলা উচিত যে, আধ্যাত্মিক বাস্তবতার নিরিখে আমি তিনিই। এ কথা আমার ধারণা বা অনুমান থেকে বলছি না বরং সেই খোদা যিনি পৃথিবী ও আকাশের খোদা, তিনি আমার সামনে এটি প্রকাশ করেছেন। আর এটি একবার নয়, বরং কয়েকবার আমাকে বলেছেন যে, তুমি **হিন্দুদের** জন্য রাজা কৃষ্ণ এবং **মুসলমান** ও **খ্রীষ্টানদের** জন্য **মসীহে মাওউদ**। আমি জানি অজ্ঞ মুসলমানগণ এ কথা শুনে তাৎক্ষণিকভাবে বলবে যে, এক কাফিরের নাম ধারণ করে কুফরীকে প্রকাশ্যভাবে গ্রহণ করল। কিন্তু এটি খোদার ওহী, যা আমি প্রকাশ না করে পারি না। আর আজই প্রথম দিন যে, আমি এত বড় সমাবেশে এ কথা উপস্থাপন করছি। কেননা যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকেন তাঁরা কোন সমালোচকের ভয় করেন না।

এখন স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, আমার কাছে যা প্রকাশ করা হয়েছে তা হলো, **রাজা কৃষ্ণ** সত্যিকার অর্থে এমন একজন পূর্ণমানব ছিলেন যার দৃষ্টান্ত হিন্দুদের কোন ঋষি এবং অবতারের মাঝে পাওয়া যায় না। তিনি তাঁর যুগের অবতার বা নবী ছিলেন যার উপর খোদার পক্ষ থেকে রূহুল কুদুস নাযেল হয়েছিল। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজয়ী এবং সম্মানিত ছিলেন। তিনি **আর্যাবর্তের** জমিনকে পাপ থেকে পরিচ্ছন্ন করেছিলেন। তিনি স্বীয় যুগের সত্য নবী ছিলেন। তাঁর

শিক্ষাকে পরে অনেক বিকৃত করা হয়েছে। তিনি খোদা-প্রেমে পূর্ণ ছিলেন, পুণ্যের প্রতি আসক্তি আর দুষ্কৃতির প্রতি শক্রতা রাখতেন। শেষ যুগে তাঁর বুরূজ অর্থাৎ অবতার সৃষ্টি করা খোদার প্রতিশ্রুতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং এ প্রতিশ্রুতি আমার আবির্ভাবের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে। অন্য যেসব ইলহাম আমার উপর হয়েছে এর সাথে আমার নিজের সম্পর্কে এ ইলহামও হয়েছিল, **“হে কৃষ্ণ-রুদ্র গোপাল! তোমার মহিমা গীতাতে লেখা হয়েছে।”** সুতরাং আমি কৃষ্ণকে ভালবাসি কেননা আমি তাঁর বিকাশস্থল। এখানে আর একটি রহস্য রয়েছে, তা হলো, যেসব গুণ কৃষ্ণের সাথে সম্পর্কিত দেখানো হয়েছে, (অর্থাৎ পাপ বিনাশকারী, দরিদ্রের মনজয়কারী এবং তাদের লালনকারী) মসীহে মাওউদও সেসব গুণের অধিকারী হবেন। বস্তুত আধ্যাত্মিকতার নিরিখে কৃষ্ণ এবং মসীহে মাওউদ একই, শুধু জাতিগত পরিভাষায় ভিন্নতা রয়েছে। এখন আমি কৃষ্ণ হিসেবে আর্য সাহেবদেরকে তাদের কিছু ভ্রান্তির ব্যাপারে সাবধান করতে চাই। সেগুলোর একটি কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আত্মা ও কণিকা যাদেরকে প্রকৃতি বা পরমাণু বলা হয়, সে সম্পর্কে বলা হয় যে, তা সৃষ্ট নয় এবং তা অনাদি- এ রীতি এবং এ বিশ্বাস সঠিক নয়। সেই পরমেশ্বর ছাড়া অন্য কেউ সৃষ্টির উর্দ্ধে নয়। তিনি অন্য কারও সাহায্যে জীবিত নন। কিন্তু সেসব বস্তু যা অন্য কারো সাহায্যে জীবিত তা সৃষ্টির উর্দ্ধে হতেই পারে না। আত্মার গুণাবলী কি নিজ থেকেই বিদ্যমান? সেগুলোর কি কোন স্রষ্টা নেই? এটি যদি সঠিক হয় তাহলে আত্মার দেহে প্রবেশও নিজে নিজেই হতে পারে। আর কণিকার একত্র হওয়া এবং বিচ্ছিন্ন হওয়াও নিজে নিজেই হতে পারে। বিবেক যদি একথাকে মানতে পারে যে, সকল আত্মা স্বীয় গুণাবলীসহ নিজেই বিদ্যমান, এতে পরমেশ্বরকে মানার কোন যুক্তিগত প্রমাণ আপনাদের হাতে থাকবে না। কেননা বিবেক যদি একথাকে গ্রহণ করতে পারে যে, সমস্ত আত্মা তাদের অন্তর্নিহিত গুণাবলীসহ নিজেই বর্তমান তাহলে দ্বিতীয় কথাকেও সানন্দে গ্রহণ করা হলো যে, আত্মা ও দেহের পারস্পরিক সংযোজন বা বিয়োজনও নিজ থেকেই হয়েছে। তাছাড়া যেখানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে হওয়ার রাস্তা খোলা সেখানে এক রাস্তা খোলা রেখে দ্বিতীয় রাস্তা বন্ধ করার কোন কারণ নেই। কোন যুক্তির আলোকে এ রীতি সঠিক হতে পারে না।

পুনরায় এ ভ্রান্তি আর্য সাহেবদেরকে আর একটি ভ্রান্তিতে নিপতিত করেছে। যার

ফলে তাদের নিজেদের ঠিক সেভাবে ক্ষতি হযেছে যেভাবে প্রথম ভুলের ফলে পরমেশ্বরের ক্ষতি হয়েছে। তা হলো আর্যরা মুক্তিকে সাময়িক জ্ঞান করেছে এবং **পুনর্জন্ম ও জন্মান্তরবাদকে চিরতরে গলার হার** আখ্যা দিয়েছে যা থেকে কখনও পরিত্রাণ সম্ভব নয়। এ কার্পণ্য ও সংকীর্ণ মনোভাব দয়ালু ও কৃপালু খোদার উপর চাপানোকে সুস্থ বিবেক কখনও গ্রহণ করতে পারে না। যেখানে পরমেশ্বর চিরস্থায়ী মুক্তি দেওয়ার শক্তি রাখেন এবং সব শক্তির অধিকারী, সেখানে বুঝা যায় না, এ কার্পণ্য তিনি কেন করলেন? কেন আপন কুদরতের কল্যাণরাজী থেকে বান্দাদের বঞ্চিত রাখলেন? তাছাড়া এ আপত্তি আরও প্রকট আকার ধারণ করে যখন দেখা যায়, সব আত্মাকে একটি অতি দীর্ঘ শাস্তিতে নিপতিত করেছেন এবং চিরস্থায়ীভাবে জন্মান্তরের শাস্তি ভোগার কষ্ট তাদের অদৃষ্টে লিখে দিয়েছেন, অথচ সেসব আত্মা পরমেশ্বরের সৃষ্টিও নয়। আর্য সাহেবদের পক্ষ থেকে এর উত্তর যা শোনা যায় তা হলো, পরমেশ্বর স্থায়ী মুক্তি দেয়ার শক্তি রাখতেন বটে, কেননা তিনি যে সর্বশক্তিমান, কিন্তু সাময়িক মুক্তি প্রস্তাব করার কারণ হলো জন্মান্তরবাদের ধারাকে অটুট রাখা। যেহেতু রূহের একটি সুনির্দিষ্ট সংখ্যা আছে তা থেকে বেশি হতে পারে না এমন পরিস্থিতিতে স্থায়ী মুক্তি দেওয়া হলে জন্মান্তরের ধারা অব্যাহত থাকতো না। কেননা যে আত্মা স্থায়ী মুক্তি পেয়ে মুক্তিখানায় যায় তা তো পরমেশ্বরের হাত থেকে যেন বেরিয়ে গেল আর এ প্রাত্যহিক খরচের শেষ ফলাফল যা অবধারিত তা হলো একসময়ে জন্মান্তরের চক্রে ফেলার জন্য একটি আত্মাও পরমেশ্বরের হাতে থাকতো না। আর কোন দিন এ কাজ চূড়ান্ত হয়ে পরমেশ্বর অকেজো হয়ে বসে যেতেন। এ সকল সীমাবদ্ধতার কারণে পরমেশ্বর যে ব্যবস্থা করেছেন তা হলো তিনি মুক্তিকে কিছুটা সীমিত রেখেছেন। এ স্থানে আরও একটি আপত্তি দাঁড়ায় আর তাহলো যেসব নিষ্পাপ একবার মুক্তি পেয়েছেন আর পাপ থেকে পবিত্র হয়েছেন পরমেশ্বর তাদেরকে বার বার মুক্তিখানা থেকে বের করেন? এ আপত্তিকে পরমেশ্বর যেভাবে খণ্ডন করেছেন তাহলো, প্রত্যেক ব্যক্তি যাকে মুক্তির ঘরে প্রবিষ্ট করেছেন তার উপর একটি পাপ চাপিয়েছেন। সে পাপের শাস্তি হিসেবে অবশেষে সাধু আত্মা মুক্তি খানা থেকে বহিষ্কৃত হয়।

এ হলো আর্য সহেবদের নীতি। এখন ইনসাফ করা উচিত, যে ব্যক্তি এ সকল সীমাবদ্ধতার মাঝে আবদ্ধ তাকে পরমেশ্বর কীভাবে বলা যেতে পারে।

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, আর্য সাহেবরা স্রষ্টার সৃষ্টির মত একটি স্বচ্ছ বিষয়কে অস্বীকার করে নিজেদেরকে বড় সমস্যায় ঠেলে দিয়েছে এবং পরমেশ্বরের কার্যাবলীকে নিজেদের কার্যাবলীর মত অনুমান করে তাঁর অবমাননাও করেছে; আর তারা এটিও চিন্তা করল না যে, খোদা সব বৈশিষ্ট্যে সৃষ্টি থেকে পৃথক, আর সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যের মাপকাঠিতে খোদাকে মাপা এমন একটি ভ্রান্তি যাকে তর্কবিদগণ কিয়াস মাআল ফারেক (ভিন্ন শ্রেণীর সাথে তুলনা) নাম দিয়ে থাকেন। এ কথা বলা যে, নাস্তি থেকে অস্তিত্বের জন্ম হতে পারে না, এটি সৃষ্টির কার্যধারা সম্পর্কে মানব মস্তিষ্কের একটি ক্রুটিপূর্ণ উপসংহার। সুতরাং খোদার গুণাবলীকে এ নীতির অধীনস্থ করা নির্বুদ্ধিতা নয় তো কী? খোদা দৈহিক জিহ্বা ছাড়া কথা বলেন, কোন বাহ্যিক কান ছাড়া শোনেন এবং দৈহিক চোখ ছাড়া দেখেন, অনুরূপভাবে বাহ্যিক উপকরণ ছাড়া সৃষ্টি করেন। তাঁকে বস্তুর মুখাপেক্ষী করা ঐশী-বৈশিষ্ট্য থেকে অব্যাহতি দেওয়ার নামান্তর। তা ছাড়া এ বিশ্বাসে আরও একটি মারাত্মক ক্রুটি রয়েছে, তা হলো এ বিশ্বাস অনাদি হওয়ার বৈশিষ্ট্যে প্রতিটি পরমাণুকে খোদাতাআলার শরীক আখ্যা দেয়। মূর্তি পূজারীরা শুধু কয়েকটি মূর্তিকেই খোদাতাআলার শরীক আখ্যা দিতো কিন্তু এ বিশ্বাসের নিরিখে সারা পৃথিবী খোদার শরীক। কেননা প্রতিটি বিন্দু আপন সত্তায় নিজেই খোদা। খোদাতাআলা জানেন, আমি এসব কথা কোন বিদ্বেষ বা শত্রুতার বশবর্তী হয়ে বলছি না বরং আমি বিশ্বাস করি যে, বেদের মূল শিক্ষা আদৌ এটি হবে না। আমি জানি ভূঁইফোড় দার্শনিকদের এমন বিশ্বাস ছিল যাদের অনেকেই পরে নাস্তিক হয়ে গেছে। আমার আশঙ্কা রয়েছে যে, আর্যরা যদি এমন বিশ্বাসকে পরিত্যাগ না করে তাহলে তাদের পরিণামও এটিই হবে। তাছাড়া এ বিশ্বাসের শাখা যা জন্মান্তরবাদ ও পুনর্জন্ম তা-ও আশিসের কৃপা ও অনুগ্রহের উপর মারাত্মক কলঙ্কের ছাপ সৃষ্টি করে। কেননা, আমরা দেখি যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ দু'এক বিঘত স্থানে এত পিঁপড়া দেখা যায় যাদের সংখ্যা কয়েক কোটির উর্দ্ধে চলে যায়, আর প্রতি ফোটা পানিতে কয়েক হাজার পোকা থাকে। নদী, সমুদ্র ও জঙ্গল বিভিন্ন ধরনের প্রাণী ও কীটে পরিপূর্ণ যাদের সাথে মানুষের সংখ্যার কোন তুলনাই হয় না। এ পরিস্থিতিতে মনে প্রশ্ন জাগে যে, কথার কথা যদি পুনর্জন্মের ধারণা সঠিক হয় তাহলে আজ পর্যন্ত পরমেশ্বর কী সৃষ্টি করেছেন? আর কাকে মুক্তি দিয়েছেন? এবং ভবিষ্যতে কী আশা করা যেতে পারে?

তাছাড়া শাস্তি দেয়া আর শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অপরাধ সম্পর্কে অবহিত না করার এ নিয়মটিও বোধগম্য নয়। অধিকন্তু বড় সমস্যা হলো, মুক্তিতো জ্ঞানের মাধ্যমে লাভ হয়ে থাকে আর জ্ঞান ক্রম-ক্ষয়িষ্ণু। কোন জন্মে জন্মগ্রহণকারী কোন ব্যক্তি যত পন্ডিতই হোক না কেন বেদের কোন অংশ তার মনে থাকে না। তাই বুঝা গেল জন্মান্তরের মাধ্যমে মুক্তি লাভ অসম্ভব। তাছাড়া জন্মান্তরের আবর্তে পড়ে যেসব পুরুষ ও মহিলা পৃথিবীতে আসে তাদের সাথে এমন কোন তালিকা আসে না যার মাধ্যমে তারা আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে অবগত হতে পারত যেন কোন হতভাগা এমন নবজাতিকাকে না বিয়ে করে বসে, যে প্রকৃতপক্ষে তার বোন বা মা।

আজকাল আর্যদের ভিতর প্রচলিত নিয়োগের বিষয়টি সম্পর্কে তো আমরা বারংবার এ নসীহতই করি যে, যতটা সম্ভব এটিকে পরিত্যাগ করা উচিত। এক ব্যক্তি তার সম্মানিতা স্ত্রীকে, যার সাথে তার সমূহ মান-সম্মানের সম্পর্ক, বৈধ স্বামী হয়ে এবং স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও নিজের সতী-স্বাধ্বী স্ত্রীকে শুধু সন্তান লাভের আকাঙ্খায় অন্যের সাথে সহবাস করাবে মানব প্রকৃতি মোটেই এটিকে গ্রহণ করবে না। এ বিষয়ে আমরা বেশি কিছু লিখতে চাই না, শুধু সভ্য লোকদের বিবেকের উপর ছেড়ে দিচ্ছি। এ সব সত্ত্বেও আর্য সাহেবরা মুসলমানদেরকে তাদের এ ধর্মের দিকে আহ্বান করছে। সুতরাং আমরা বলছি, প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তি সত্যকে গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকে। কিন্তু সেই খোদাকে তাঁর সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য থেকে অব্যাহতি দেয়া যিনি স্বীয় মহিমান্বিত কুদরতের মাধ্যমে নিজ অস্তিত্বকে প্রকাশ করেছেন, এবং তাঁকে সমুদয় কল্যাণের বিকাশস্থল মনে না করা সততা নয়। এমন পরমেশ্বর মোটেই পরমেশ্বর হতে পারেন না। মানুষ খোদাকে তাঁর শক্তির মাধ্যমে চিনেছে। তাঁর যদি কোন কুদরতই না থাকে আর তিনিও যদি আমাদের মত উপকরণের মুখাপেক্ষী হন তাহলে তাঁকে সনাক্ত করার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

অধিকন্তু খোদাতাআলা স্বীয় অনুগ্রহরাজির কারণেও ইবাদতের যোগ্য। কিন্তু তিনি যেহেতু আত্মাকে সৃষ্টি করেন নি, আর কোন কর্মীর ক্রিয়া ছাড়া আশিস ও অনুগ্রহ করার বৈশিষ্ট্য তাঁর নেই, তাই প্রশ্ন দাঁড়ায়, এমন পরমেশ্বর কীভাবে ইবাদতের যোগ্য হতে পারে? আমরা যত ভাবী আমাদের এটিই মনে হয়

যে, আর্য সাহেবরা নিজেদের ধর্মের ভাল নমুনা পেশ করেন নি। পরমেশ্বরকে এমন দুর্বল ও প্রতিশোধপরায়ণ সাব্যস্ত করেছেন যে, তিনি হাজার কোটি বছর শাস্তি দিয়েও স্থায়ী মুক্তি দেন না। তার ক্রোধ কখনও কমেই না। আর্য সাহেবরা জাতীয় সভ্যতার উপর নিয়োগের কলঙ্ক খচিত করেছেন। এভাবে তারা অবলা নারীদের সম্মানের ওপর আক্রমণ করেছেন। এ ধর্ম পরমেশ্বরকে অব্যাহতি দেওয়ার দিক থেকে নাস্তিকদের খুব কাছের আর নিয়োগের দিক থেকে একটি অনুল্লেখযোগ্য জাতির কাছাকাছি।

এখানে আমাকে ব্যথিত হৃদয়ে এ কথাও বলতে হলো যে, অধিকাংশ সম্মানিত আর্য সাহেব এবং খ্রীষ্টান মহোদয়গণের এমনিতেই ইসলামের সত্য ও পরিপূর্ণ নীতির উপর অযথা আক্রমণের অনেক অভ্যাস আছে। কিন্তু তারা নিজেদের ধর্মে আধ্যাত্মিকতা সৃষ্টির বিষয়ে বড় উদাসীন। মানুষ পৃথিবীর মহান নবী এবং রসূলদের নোংরা ভাষায় স্মরণ করবে ধর্ম এ বিষয়ের নাম নয়। এমন করা ধর্মের মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। বরং ধর্মের উদ্দেশ্য হলো স্বীয় নফসকে সকল পাপ মুক্ত করে মানুষের সদা খোদাতাআলার আস্তানায় ঝুঁকে থাকার যোগ্য করে তোলা। আর একীন, প্রেম, তত্ত্ব-জ্ঞান, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় যেন সে সমৃদ্ধ হয় এবং তার মাঝে যেন এক বিশুদ্ধ পরিবর্তন আসে আর যেন এ পৃথিবীতেই সে স্বর্গীয় জীবন লাভ করে। কিন্তু এমন বিশ্বাস পোষণ করলে সত্যিকারের পুণ্য কখন এবং কীভাবে অর্জিত হতে পারে, যাতে মানুষকে শুধু এ শিক্ষা দেয়া হয় যে, মসীহের মৃত্যুতে ঈমান আন আর এরপর মনে মনে ভাব যে, পাপমুক্ত হয়ে গেছ? এটি কেমন পবিত্রতা যাতে আত্মার পবিত্রতার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই? বরং মানুষ যদি নোংরা জীবন থেকে ফিরে একটি পবিত্র জীবনের প্রত্যাশী হয় তা হলেই সত্যিকারের পবিত্রতা অর্জিত হয়। এটা লাভের জন্য শুধু তিনটি বিষয় আবশ্যক। প্রথমতঃ চেষ্টা এবং সংগ্রাম, অর্থাৎ যতটা সম্ভব নোংরা জীবন থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করবে। দ্বিতীয়তঃ দোয়া অর্থাৎ সদা খোদার নিকট ক্রন্দনরত থাকা যেন তিনি নোংরা জীবন থেকে নিজ হাতে তাকে বের করে নিয়ে আসেন এবং এমন এক অগ্নি তার মাঝে সৃষ্টি করেন যা পাপের কলুষতাকে ছাই করে দেয়। আর এমন এক শক্তি তাকে প্রদান করেন যা আবেগের তাড়নার উপর জয়যুক্ত হয়। আর তার উচিত ততক্ষণ সেই দোয়ায় রত থাকা যতক্ষণ না এক ঐশী নূর তার হৃদয়ে অবতরণ করে এবং এমন একটি উজ্জ্বল কিরণ তার

নফসে পড়ে যা সকল অন্ধকারকে দূরীভূত করে এবং তার দুর্বলতাসমূহ দূর করে, তার মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করে। কেননা, দোয়াতে নিঃসন্দেহে প্রভাব রয়েছে মৃত যদি জীবিত হতে পারে তবে তা দোয়ার মাধ্যমে, আর বন্দী যদি মুক্তি পেতে পারে তা-ও দোয়ার মাধ্যমে। কিন্তু দোয়া করা এবং মৃত্যু একই ধরনের বিষয়। তৃতীয় পদ্ধতি হলো কামেল এবং পুণ্যবানদের সাহচর্য। কেননা এক প্রদীপের মাধ্যমে অন্য প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হতে পারে। বস্তুত পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভের এ তিনটি পদ্ধতি যা একীভূত হলে অবশেষে আশিস এর সাথে এসে মিলিত হয়, মসীহের খুন হওয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করে মনে মনে এ আত্মপ্রসাদ নেয়ার মাঝে নয়, যে আমরা পাপ মুক্ত হয়ে গেছি। এটি আত্মপ্রতারণা। মানুষকে একটি মহান উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। শুধু পাপ পরিত্যাগ করাই তার পরাকাষ্ঠা নয়। অনেক প্রাণী মোটেই পাপ করে না সে কারণে তারা কি পবিত্র আখ্যা পেতে পারে? তোমার বিরুদ্ধে আমরা কোন অন্যায় করি নি এ কথা বলে আমরা কি কোন ব্যক্তির নিকট থেকে কোন পুরস্কার পেতে পারি? আসলে আন্তরিক খেদমতের মাধ্যমে পুরস্কার লাভ হয়। আর আল্লাহ্‌র পথে সেই খেদমত হলো, মানুষ যেন শুধু তাঁর হয়ে যায় আর তাঁর ভালবাসার মাধ্যমে সকল ভালবাসাকে ছিন্ন করে এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সে নিজের ইচ্ছাকে পরিত্যাগ করে। এ স্থানে কুরআন করীম খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েছে। তা হলো কোন মুমিন ততক্ষণ কামেল হতে পারবে না যতক্ষণ সে দুটো শরবত পান না করবে। প্রথম পানীয় পাপের প্রতি আসক্তি স্তিমিত হওয়ার, যার নাম কুরআন করীম **‘কাফুরী শরবত’** রেখেছে। দ্বিতীয় শরবত হৃদয়ে আল্লাহ্‌র ভালবাসাকে স্থান দেয়ার, যার নাম কুরআন করীম **‘যানজাবীলী পানীয়’** রেখেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, খ্রীষ্টান ও আর্য সাহেবরা এ পথকে অবলম্বন করেন নি। আর্য সাহেবরা এ দিকে ঝুঁকছেন যে, তওবা হোক বা না হোক পাপ সর্ব রকম পরিস্থিতিতে শাস্তিযোগ্য। এর ফলশ্রুতিতে অগণিত জন্মের শাস্তি ভোগ করতে হবে। আর খ্রীষ্টান সাহেবগণ পাপ থেকে পরিত্রাণের সেই পথ বর্ণনা করেন যা আমি এখন উল্লেখ করেছি। উভয় পক্ষ আসল লক্ষ্য থেকে দূরে ছিট্‌কে পড়েছে। আর যে দ্বার দিয়ে প্রবেশ করা উচিত ছিল তাকে ছেড়ে দূর-দূরান্তের জঙ্গলে ঘুরে মরছে।

এ কথা আমি আর্য সাহেবদের খেদমতে নিবেদন করলাম, আর খ্রীষ্টান সাহেবরা, যারা বড় শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে পৃথিবীতে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার করছেন, তাদের

অবস্থা আর্য সাহেবদের তুলনায় বেশি দুঃখজনক। এ যুগে আর্য সাহেবদের প্রচেষ্টা হলো কোনভাবে তাদের পুরনো ধর্ম, সৃষ্টির ইবাদত থেকে বেরিয়ে আসা। আর খ্রীষ্টান সাহেবরা শুধু নিজেরাই সৃষ্টির পূজায় রত নয় বরং সারা পৃথিবীকে এতে ডুবানোর চেষ্টায় রত। হযরত মসীহকে শুধু কৃত্রিমভাবে এবং এক তরফাভাবে খোদা বানানো হয়। তাঁর মাঝে এমন একটি বিশেষ শক্তিও প্রমাণিত হয় নি যা অন্য নবীর মাঝে পাওয়া যায় না। বরং অন্য কিছু নবী নিদর্শন প্রদর্শনে তাঁর তুলনায় এগিয়ে ছিলেন। তাঁর দুর্বলতা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তিনি শুধু মানুষ ছিলেন। নিজ সম্পর্কে তিনি এমন কোন দাবী করেন নি যার কারণে প্রমাণিত হয় যে, তিনি খোদায়ীর দাবীকারক ছিলেন। তাঁর কিছু কালাম আছে এর উপর তাঁর খোদা হওয়ার ভিত্তি রাখা হয়। কিন্তু এমনটি জ্ঞান করা শুধু ভুল। রূপক বা উপমার অর্থে এ ধরনের হাজার হাজার কালাম খোদার নবীদের থেকেই থাকে। এসব কিছুর কারণে খোদা হওয়া অর্থ করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়, বরং এটা তাদের কাজ যারা অনর্থক মানুষকে খোদা বানানোর আগ্রহ রাখে, আর আমি খোদার কসম খেয়ে বলতে পারি, আমার ইলহাম এবং ওহীতে তাঁর তুলনায় অনেক বেশি এমন কালাম রয়েছে। সুতরাং এসব উক্তি বা বাক্যের কারণে হযরত মসীহের ঈশ্বরত্ব প্রমাণিত হলে আমারও নাউযুবিল্লাহ্ একই দাবী করার অধিকার থাকে। স্মরণ রেখো খোদা হওয়ার দাবীটি মসীহের উপর একটি অপবাদ। তিনি মোটেই এমন দাবী করেন নি। তিনি নিজের সম্পর্কে যা-ই বলেছেন- তা **‘শাফাআত’** শব্দের সীমার উর্দ্ধে নয়। সুতরাং নবীদের শাফাআতের কথা কে অস্বীকার করতে পারে? হযরত মূসার শাফাআতের কারণে বনী ইসরাঈল কয়েকবার লেলিহান অগ্নি থেকে রক্ষা পেয়েছে। এ বিষয়ে আমি নিজেও অভিজ্ঞ। আর আমার জামাতের অধিকাংশ সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ খুব ভালভাবে জানেন, আমার শাফাআতের কারণে অনেক সমস্যাকবলিত ও রোগাক্রান্ত ব্যক্তি নিজেদের দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। আর এ সংবাদ তাদেরকে পূর্বেই দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া স্বীয় উম্মতের মসীহের ক্রুশে মারা যাওয়া আর উম্মতের পাপ তাঁর উপর চাপানো এমন একটি অর্থহীন বিশ্বাস, যা কখনও বিবেকের সাথে দূরতম সম্পর্ক রাখে না। খোদার বৈশিষ্ট্য আদল ও ইনসাফ। তাঁর পক্ষে এটি সম্ভবই নয় যে, পাপ করবে কেউ আর শাস্তি অন্য আর এক জনকে দেওয়া হবে। এ বিশ্বাস

প্রকৃতপক্ষে বহু ভ্রান্তির সমষ্টি। এ খোদা যার কোন শরীক নেই তাঁকে পরিত্যাগ করা এবং সৃষ্টির পূজা করা বুদ্ধিমানদের কাজ নয়। তিন স্বাধীন এবং পূর্ণাঙ্গ অস্তিত্বের প্রস্তাবনা যাদের সকলেই প্রতাপ এবং শক্তিতে সমান, আর তিন জনের মিশ্রণ ঘটিয়ে এক খোদা বানানো; এটি এমন একটি যুক্তি যা পৃথিবীতে শুধু খ্রীষ্টানদেরই বিশেষত্ব। তারপর আক্ষেপের বিষয় হলো, যে উদ্দেশ্যে এ নতুন পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে তা হলো পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া এবং এ পৃথিবীর নোংরা জীবন থেকে মুক্তি পাওয়া; কিন্তু সে উদ্দেশ্যও তো অর্জিত হলো না। বরং প্রায়শ্চিত্তবাদের বিশ্বাসের পূর্বে হাওয়ারীদের অবস্থা যেমন পরিচ্ছন্ন ছিল, এ পৃথিবীর ধন-দৌলতের প্রতি তাঁদের কোন আসক্তি ছিল না। পৃথিবীর নোংরামীতে তাঁরা আবদ্ধ ছিলেন না। তাঁদের প্রচেষ্টা ইহজাগতিক আয় উপার্জনের উদ্দেশ্যে ছিল না। প্রায়শ্চিত্তবাদ এবং মসীহের রক্তের উপর যতই জোর দেওয়া হচ্ছে খ্রীষ্টানরা ততই ইহজাগতিকতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হচ্ছে এবং তাদের অধিকাংশ নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির মত দিনরাত শুধু বস্তু জগতের কাজে মগ্ন থাকে। এখানে ইউরোপে প্রসারমান অন্যান্য পাপ, বিশেষ করে মদ্যপান ও ব্যভিচারের কথা উল্লেখের কোন প্রয়োজন নেই বললেই চলে।

এখন আমি সাধারণ দর্শকদের সামনে আমার দাবীর প্রমাণস্বরূপ কিছু কথা বর্ণনা করে এ বক্তৃতার ইতি টানব। হে সম্মানিত শ্রোতৃবর্গ, সত্য গ্রহণের জন্য খোদাতাআলা আপনাদের বক্ষ উন্মোচিত করুন এবং সত্যকে বুঝার জন্য আপনাদের উপর ইলহাম করুন। আপনাদের একথা জানা থাকবে যে, প্রত্যেক নবী ও রসূল এবং খোদাতাআলার প্রতিনিধি মানুষের সংশোধনের জন্য আসেন, যদিও তাঁর আনুগত্যের জন্য যুক্তিগত দিক থেকে এতটাই যথেষ্ট। অর্থাৎ সে যা কিছু বলে তা যেন সত্য হয়, তাতে কোন প্রকারের ধোঁকা এবং প্রতারণার উপকরণ যেন না থাকে। কেননা সুস্থ বিবেক সত্যকে গ্রহণের জন্য কোন নিদর্শনের প্রয়োজন বোধ করে না। কিন্তু যেহেতু মানব প্রকৃতিতে একটি সন্দেহেরও শক্তি নিহিত তাই একটি কথা সত্যিকার অর্থে সঠিক ও সত্য এবং বাস্তব হয়ে থাকলেও মানুষের মনে সন্দেহ জাগে যে, কোথাও বর্ণনাকারীর কোন স্বার্থ তো নেই? বা কোথাও সে প্রতারিত তো হয় নি, বা ধোঁকা তো দেয়

নি? আর কখনও তার সাধারণ মানুষ হওয়ার কারণে তার কথার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ হয় না এবং তাকে তুচ্ছ ও হেয় মনে করা হয়। কোন কোন সময় অবাধ্য আত্মার কামনা-বাসনা এত প্রবল হয় যে, বলা হয় মানুষ একে সত্য বলে বুঝে কিন্তু তা সত্ত্বেও নফস স্বীয় অপবিত্র আবেগের সামনে এমনভাবে পরাভূত থাকে যে, সে সেই পথে চলতে পারে না যার উপর ওয়াজ-নসিহতকারী তাকে চালাতে চান বা তার প্রকৃতিগত দুর্বলতা তাকে পদক্ষেপ নেয়া থেকে বিরত রাখে। তাই ঐশী প্রজ্ঞার দাবী এই যে, যারা খোদার পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়ে আসেন তাদের সাথে যেন ঐশী সাহায্যেরও কিছু নিদর্শন থাকে, যা কখনও রহমতের আকারে আর কখনও শাস্তির আকারে প্রকাশ পায়। সেসব নিদর্শনের কারণে তাঁরা খোদার পক্ষ থেকে **সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী** আখ্যা পান। কিন্তু রহমতের নিদর্শনাবলী থেকে শুধু সেসব মু'মিন অংশ পান যারা খোদার নির্দেশের সামনে অহংকার করেন না, খোদার মনোনীত ব্যক্তিদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখেন না, স্বীয় খোদা-প্রদত্ত অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে কোন প্রকারের হঠকারিতা প্রদর্শন করেন না। তাঁদেরকে সনাক্ত করেন এবং তাকওয়ার পথকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেন। ইহজাগতিক অহঙ্কার ও মিথ্যা সম্মানের নামে সত্যকে এড়িয়ে চলেন না, বরং যখন দেখেন, **নবীদের সুন্নত** অনুসারে এক ব্যক্তি নিজ সময়ে দণ্ডায়মান হয়েছেন যিনি খোদার দিকে ডাকেন, আর তাঁর কথা এমন যে, সেসব কথার সত্যতা মানার জন্য একটি রাস্তা বর্তমান রয়েছে এবং তাতে ঐশী সাহায্য এবং তাকওয়া ও বিশ্বস্ততার নিদর্শন দেখা যায় আর নবীদের সুন্নতের মাপকাঠিতে তাঁদের কথা ও কর্মে কোন আপত্তি বর্তায় না তখন তারা এমন মানুষকে গ্রহণ করেন। বরং কিছু সৌভাগ্যবান লোক এমনও হয়ে থাকেন, তারা চেহারা দেখে চিনে যান যে, এটি মিথ্যাবাদী ও প্রতারকের চেহারা নয়। সুতরাং এমন লোকদের জন্য রহমতের নিদর্শন প্রকাশ পায় এবং তারা প্রতি মুহূর্তে এক সত্যবাদীর সাহচর্যে ঈমানী শক্তি পেয়ে এবং পবিত্র পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে তাজা নিদর্শন দেখতে থাকেন আর সকল সত্য ও নিগুঢ় তত্ত্বজ্ঞান, সব সাহায্য ও সমর্থন, সব রকমের অদৃশ্যের সংবাদাদি তাঁদের সত্যতার নিদর্শনই হয়ে থাকে। তারা নিজেদের চিন্তাধারার সূক্ষ্মতার কারণে প্রেরিত ব্যক্তির পক্ষে খোদাতাআলার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সাহায্যকে অনুধাবন করে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিদর্শনকেও বুঝতে পারেন। অপরদিকে এমন মানুষও আছে, রহমতের নিদর্শন থেকে অংশ নেওয়া যাদের অদৃষ্টে নেই।

দৃষ্টান্তস্বরূপ নূহের জাতি নিমজ্জিত হওয়ার নিদর্শন ছাড়া অন্য কোন নিদর্শন থেকে অংশ পায় নি। লূতের জাতি তাদের জমিন উলট-পালটের নিদর্শন এবং তাদের উপর যে পাথর বর্ষণ করা হয়েছে তা ছাড়া অন্য কোন নিদর্শন থেকে লাভবান হয় নি। অনুরূপভাবে এ যুগে আল্লাহ্ আমাকে প্রত্যাদিষ্ঠ করেছেন কিন্তু আমি এ যুগের অধিকাংশ মানুষের প্রকৃতিতে নূহের যুগের লোকদের সামঞ্জস্য দেখছি। বেশ কয়েক বছর হয়ে গেছে আমার পক্ষে আকাশে দুটি নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে। এ ছিল নবীদের ক্রমধারায় ঐতিহ্যগত একটি ভবিষ্যদ্বাণী। আর তা হলো, শেষ যুগের ইমাম যখন আবির্ভূত হবেন তখন তার জন্যে দুটো নিদর্শন প্রকাশ পাবে। এটা কখনও কোন ব্যক্তির জন্য প্রকাশ পায় নি অর্থাৎ আকাশে রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণ দেখা দিবে, আর গ্রহণ চন্দ্রগ্রহণের নির্ধারিত রাতগুলোর প্রথম রাত হবে। আর সমসাময়িক দিনগুলোতে অর্থাৎ রমযানেই সূর্যগ্রহণ হবে, আর সে গ্রহণ সূর্যগ্রহণের দিনগুলোর মধ্যবর্তী দিনে হবে। এ ভবিষ্যদ্বাণী সুন্নি ও শিয়া উভয়ের সর্ববাদীসম্মত ভবিষ্যদ্বাণী। আর লেখা আছে,পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি কখনও এমন ঘটনা নির্ধারিত তারিখে ইমামতের দাবীকারকের উপস্থিতিতে ঘটে নি। কিন্তু শেষ যুগের ইমামের সময়ে এমনটি ঘটবে আর এ নিদর্শন তাঁর জন্যই। এ ভবিষ্যদ্বাণী সেসব বইতে লেখা হয়েছে যা আজ থেকে হাজার বছর পূর্বে পৃথিবীতে ছেপেছে। কিন্তু এ ভবিষ্যদ্বাণী যখন আমার ইমামতের দাবীর সময়ে প্রকাশ পেল, তখন কেউ তা গ্রহণ করে নি। আর এক ব্যক্তিও এ মহান ভবিষ্যদ্বাণীকে দেখে আমার হাতে বয়াত করে নি বরং গালি ও তিরস্কারে আরও বেড়ে গেছে। আমার নাম দাজ্জাল, কাফির, কাযযাব ইত্যাদি রাখা হয়েছে। এটি হওয়ার কারণ হলো, এ ভবিষ্যদ্বাণী শাস্তিস্বরূপ ছিল না বরং ঐশী রহমত যথা সময়ে একটি নিদর্শন প্রকাশ করেছে। কিন্তু মানুষ সে নিদর্শনকে আদৌ কাজে লাগায় নি এবং তাদের হৃদয়ে আমার দিকে আদৌ আকর্ষণ সৃষ্টি হয় নি। এটি যেন কোন নিদর্শনই ছিল না। একটি বৃথা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। তারপর অস্বীকারকারীদের দম্ভ যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন খোদা ধরাপৃষ্ঠে একটি শাস্তির নিদর্শন দেখালেন। প্রাচীণকালে নবীদের কিতাবে এটা লেখা হয়েছিল। আর সে শাস্তির নিদর্শন হলো, কয়েক বছর ধরে এ দেশকে প্লেগ গ্রাস করছে এবং কোন মানবীয় পরিকল্পনা এর সামনে সফল হচ্ছে না। এ প্লেগের সংবাদ কুরআন শরীফে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ আছে। যেমন আল্লাহতাআলা বলেন,

وَاِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اَوْ مُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا

(সূরা বনী ইসরাঈল, **17: 59**)

অর্থাৎ কিয়ামতের কিছুকাল পূর্বে অনেক ভয়াবহ মহামারী দেখা দিবে এর ফলশ্রুতিতে কোন কোন গ্রাম পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর অনেক গ্রাম কিছুটা শাস্তি ভোগার পর রেহাই পাবে। অনুরূপভাবে অন্য একটি আয়াতে খোদাতাআলা বলেন,যার অনুবাদ হল কেয়ামত সন্নিকট হলে জমি থেকে আমরা একটি কীট বের করব যা মানুষকে কামড়াবে। এটি এজন্য হবে যে, তারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে গ্রহণ করে নি। এ উভয় আয়াত কুরআন শরীফে রয়েছে। এটি প্লেগ সম্পর্কে স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী। কেননা প্লেগও এক ধরনের কীট। যদিও পূর্বের চিকিৎসকগণ এ কীট সম্পর্কে অবগত ছিলেন না, কিন্তু আলেমুল গায়েব খোদাতাআলা জানতেন যে, প্লেগের মূল হলো একটি কীট। এটি মাটি থেকে বের হয় তাই এর নাম **‘দাব্বাতুল আরয’** রাখা হয়েছে অর্থাৎ মাটির কীট। বস্তুত যখন শাস্তির নিদর্শন প্রকাশ পেল আর সহস্য সহস্র প্রাণ পাঞ্জাবে বিনষ্ট হলো এবং এ দেশে একটি ভীতিকর ভূমিকম্পও দেখা দিল তখন কিছু মানুষ চেতনা ফিরে পেল। স্বল্প সময়ে প্রায় দু’লক্ষের মত মানুষ বয়াত গ্রহণ করল আর এখনও ব্যাপক হারে বয়াত হচ্ছে। কেননা এখনও প্লেগ স্বীয় হামলা প্রত্যাহার করে নি। আর যেহেতু এ একটি নিদর্শনস্বরূপ তাই অধিকাংশ মানুষ যতক্ষণ নিজেদের মাঝে পরিবর্তন সৃষ্টি না করবে ততক্ষণ আশা করা যায় না যে, এ রোগ এ দেশ থেকে দূর হবে। বস্তুত এ দেশ নূহের যুগের সাথে অনেক সাদৃশ্য রাখে অর্থাৎ আসমানী নিদর্শনকে দেখে তো কেউ ঈমান আনল না, কিন্তু শাস্তির নিদর্শনকে দেখে হাজার হাজার মানুষ বয়াতে অন্তর্ভূক্ত হলো। তাছাড়া পূর্বের নবীরাও প্লেগের নিদর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন। ইঞ্জিলেও মসীহে মাওউদ-এর যুগে মহামারীর কথা রয়েছে আর যুদ্ধের কথাও উল্লেখ আছে। এখন তা হচ্ছে।

সুতরাং হে মুসলমানগণ! তওবা কর, তোমরা দেখছ প্রত্যেক বছর এ প্লেগ তোমাদের প্রিয়জনকে তোমাদের থেকে বিচ্ছন্ন করছে। খোদার দিকে ঝুঁকো যেন তিনি তোমাদের দিকে দয়ার দৃষ্টি দেন। আর এখনও এটা স্পষ্ট নয় যে, প্লেগ কতকাল থাকবে আর কী হবে। আমার দাবী সম্পর্কে সন্দেহ হলে একই সাথে সত্যের সন্ধানেও যদি থাক তাহলে সে সন্দেহ দূর হওয়া খুব সহজ।

কেননা প্রত্যেক নবীর সত্যতা তিনভাবে বুঝা যায়।

প্রথমতঃ যুক্তির মাধ্যমে- অর্থাৎ দেখা উচিত, সে নবী বা রসূল যখন আসলেন সুস্থ বিবেকের সাক্ষ্য কী? তখন তাঁর আসার আদৌ প্রয়োজন ছিল, কি ছিল না? আর মানুষের এমন সময় কোন সংশোধনকারীর জন্ম নেয়ার প্রয়োজন বর্তমান অবস্থা এটা দাবী করে, না কি করে না?

দ্বিতীয়তঃ পূর্ববর্তী নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী- অর্থাৎ দেখা উচিত, পূর্বের কোন নবী তাঁর পক্ষে বা তাঁর যুগে কারো আবির্ভূত হবার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন কি না?

তৃতীয়তঃ ঐশী সাহায্য এবং আসমানী নিদর্শন, অর্থাৎ দেখা উচিত, তাঁর পক্ষে কোন স্বর্গীয় সমর্থন রয়েছে কি?

এ তিনটি লক্ষণ আল্লাহর সত্য প্রত্যাদিষ্টকে চেনার জন্য আদি থেকে নির্ধারিত। এখন হে বন্ধু! খোদাতাআলা তোমাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে এ তিনটি লক্ষণ আমার সত্যায়ণের উদ্দেশ্যে এক স্থানে একত্র করে দিয়েছেন। এখন ইচ্ছা হলে গ্রহণ কর, না হয় প্রত্যাখ্যন কর। যুক্তির নিরিখে যদি দেখ তো সুস্থ বিবেক ফরিয়াদ করছে আর কাঁদছে যে, মুসলমানদের জন্য একজন স্বর্গীয় সংস্কারকের প্রয়োজন। ভিতর ও বাইরের অবস্থা উভয়টি ভয়াবহ। মুসলমান যেন একটি গর্তের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে বা একটি প্রবল বন্যার কবলে নিপতিত। পূর্বের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সন্ধান করলে জানবে যে, দানিয়াল নবীও আমার সম্পর্কে এবং আমার এ যুগ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। আর আঁ হযরত (সা.)ও বলেছেন, মসীহ্ মাওউদ এ উম্মতেই জন্মগ্রহণ করবেন। কেউ অবগত না থাকলে সহী বুখারী ও মুসলিম দেখুক এবং শতাব্দীর শিরোভাগে মুজাদ্দেদ আগমনের ভবিষ্যদ্বাণীও পড়ে নিক। আর আমার সম্পর্কে ঐশী সাহায্য সন্ধান করতে চাইলে স্মরণ রাখা উচিত যে, এখন পর্যন্ত সহস্র সহস্র নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে।

সেসব নিদর্শনে এমন নিদর্শনও রয়েছে যা আজ থেকে ২৪ বছর পূর্বে বারাহীনে আহ্মদীয়ায় লেখা রয়েছে। আর তখন লেখা হয়েছে যখন এক ব্যক্তিও আমার সাথে বয়াতের সম্পর্ক রাখত না বা কেউ সফর করে আমার কাছে আসত না। আর সে নিদর্শন এই যে, আল্লাহ বলেন -

يأتيك من كل فجّ عميق - يأتون من كلِّ فجّ عميق

অর্থাৎ সে সময় নিকটে যখন সবদিক থেকে তোমার জন্য আর্থিক সাহায্য আসবে, আর সহস্র সহস্র সৃষ্টি তোমার কাছে আসবে। পুনরায় বলেন-

وَلَا تُصَعِّرْ لخلق الله و لا تسئم من الناس

অর্থাৎ এত মানুষ আসবে যে, তুমি তাদের সংখ্যা দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবে। সুতরাং তুমি তাদের সাথে যেন দুর্ব্যবহার না কর এবং তাদের সাথে মুলাকাত করে ক্লান্ত না হও।

সুতরাং হে প্রিয়গণ! যদিও আপনারা এ বিষয় অবগত নন যে, আমার কাছে কাদিয়ানে কত মানুষ এসেছেন এবং কত স্পষ্টভাবে এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে! কিন্তু আপনারা প্রত্যক্ষ করে থাকবেন যে, এ শহরে আমার আগমনে আমাকে দেখার জন্য শহরের স্টেশনে হাজার হাজার মানুষ একত্র হয়েছিল আর শত শত পুরুষ ও মহিলা এ শহরে বয়াত করেছেন। আর আমি সে ব্যক্তি যে বারাহীনে আহমদীয়ার যুগের ৭/৮ বছর পূর্বে এ শহরে প্রায় ৭ বছর থেকেছি। আর আমার সাথে কারো কোন সম্পর্ক ছিল না। আমার অবস্থা সম্পর্কে কেউ অবগতও ছিল না।

সুতরাং এখন চিন্তা কর এবং গভীরভাবে চিন্তা কর যে, আমার বই বারাহীনে আহমদীয়ায় এ প্রসিদ্ধি ও জন সমাগমের ২৪ বছর আগেই আমার সম্পর্কে এমন সময়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যখন আমি মানুষের দৃষ্টিতে কোন হিসেবেই আসতাম না। যদিও আমার বর্ণনানুসারে আমি বারাহীনে আহ্‌মদীয়ার প্রাক্কালে এ শহরে প্রায় সাত বছর অবস্থান করেছি তবুও আপনাদের মাঝে এমন লোক খুব অল্পই হবেন যারা আমার নিকট পরিচিত। কেননা আমি সেই সময় একজন অখ্যাত ব্যক্তি ছিলাম। সাধারণ লোকদের মাঝ থেকেই একজন ছিলাম এবং মানুষের দৃষ্টিতে আমার কোন মাহাত্ম্য ও কোন সম্মান ছিল না। কিন্তু সেই যুগ আমার জন্য বড় মধুর ছিল কেননা আসরে নির্জনতা ছিল এবং অনেক লোকের মাঝেও একাকিত্ব ছিল এবং শহরে আমি এমনভাবে থাকতাম যেন অরণ্যের মাঝে এক ব্যক্তি। এ মাটিকে আমি তেমনই ভালবাসি যেমন কাদিয়ানকে। কেননা, আমি নিজের যৌবনের প্রাথমিক কালে

এক অংশ এতে কাটিয়েছি এবং এ শহরের অলি-গলিতে অনেক চলাফেরা করেছি। আমার সেই যুগের বন্ধু এবং অকৃত্রিম সাথী - এ শহরের এক বুযুর্গ অর্থাৎ হাকীম হোসামুদ্দীন সাহেব। তিনি এখনও আমাকে অনেক ভালবাসেন। তিনি সাক্ষ্য দিতে পারেন, সেই যুগ কেমন ছিল এবং কেমন অপরিচিতির গর্তে আমার ব্যক্তিত্ব লুক্কায়িত ছিল। এখন আমি আপনাদের নিকট জিজ্ঞেস করছি, এমন যুগে এ ধরনের মহান ভবিষ্যদ্বাণী করা যে, এ ধরনের অপরিচিত ব্যক্তির অবশেষে এমন উত্থান হবে যে, লক্ষ লক্ষ মানুষ তার অনুগত এবং মুরীদ হবে এবং দলে দলে লোক তার দীক্ষা গ্রহণ করবে। শত্রুদের সাংঘাতিক বিরোধিতা সত্ত্বেও তার নিকট জনসমাগমে কোন পরিবর্তন আসবে না; বরং লোকদের সংখ্যা এত বেশি হবে যে, তারা প্রায় ক্লান্ত করে তুলবে। এটি কি মানুষের সাধ্যের কাজ? আর এমন ভবিষ্যদ্বাণী কি কোন প্রতারক করতে পারে যে, চব্বিশ বছর পূর্বে নির্জনতা ও অসহায়তার যুগে এ প্রকারের মর্যাদা এবং তার দিকে মানুষের আগমনের সংবাদ দেয়? **বারাহীনে আহ্‌মদীয়া** যার মধ্যে এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে, কোন অপরিচিত পুস্তক নয়; বরং এটা এ দেশের মুসলমান, খ্রীষ্টান এবং আর্যদের কাছেও আছে এবং সরকারের কাছেও আছে। কেউ এ মহান নিদর্শনে সন্দেহ করলে তাকে এ পৃথিবীতে এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা উচিত। এ ছাড়া আরও অনেক নিদর্শন রয়েছে, এ সম্বন্ধে এ দেশের লোকেরা অবহিত। কিছু সংখ্যক মূর্খ লোক যারা সত্যকে গ্রহণ করা পছন্দই করে না তারা প্রমাণিত সত্য হতেও লাভবান হয় না। অনর্থক সমালোচনার ছলে পলায়নের পথ খোঁজে এবং দু'একটা ভবিষ্যদ্বাণীর উপর আপত্তি করে অবশিষ্ট্য হাজার হাজার ভবিষ্যদ্বাণীকে এবং জ্বলন্ত নিদর্শনকে মাটি চাপা দেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তারা মিথ্যা বলার সময় খোদাতাআলাকে বিন্দুমাত্র ভয় করে না। মিথ্যা অপবাদ আরোপের সময় তারা পরকালের শাস্তিকেও স্মরণ করে না। তাদের অপবাদের বিবরণ দিয়ে শ্রোতাদেরকে তাদের অবস্থা শোনানোর আমার কোন প্রয়োজন নেই। তাদের মাঝে খোদা-ভীতি থাকলে এবং তারা খোদাতাআলাকে বিন্দুমাত্র ভয় করলে খোদার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করার ব্যাপারে তড়িঘড়ি করতো না। ধরে নাও তারা কোন নিদর্শন না-ও যদি বুঝতো তবে মানবতা এবং নম্রতার সাথে আমার নিকট এর স্বরূপ জিজ্ঞেস করে নেওয়া উচিত ছিল। তাদের একাট বড় আপত্তি এই, আথম নির্দিষ্ট সময়ে মরেনি এবং আহ্‌মদ বেগ যদিও ভবিষ্যদ্বাণী

অনুসারে মারা যায় কিন্তু তার জামাতা যে এ ভবিষ্যদ্বাণীর অন্তর্ভূক্ত ছিল সে-ও মরে নি।

এটাই তাদের খোদাভীতি। হাজার হাজার প্রমাণিত ভবিষ্যদ্বাণীর তো নামই মুখে নিবে না। দু'একটা ভবিষ্যদ্বাণী যা তারা বুঝতে পারে নি বারংবার সেগুলোর উল্লেখ করে এবং প্রত্যেক জনসভায় হট্টগোল বাঁধায়। খোদার ভয় থাকলে, যেসব নিদর্শন ও ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণতা লাভ করেছে তা থেকে উপকৃত হতো। এটি খোদাভীরু ব্যক্তিদের পদ্ধতি নয় যে, স্পষ্ট নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আর সূক্ষ্ম কোন বিষয় থাকলে তা নিয়ে আপত্তি উত্থাপন করে বসে। এভাবে সব নবীদের উপর আপত্তির রাস্তা খুলে যাবে আর অবশেষে এ প্রকৃতির লোকদের সকলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ হযরত ঈসা (আ.)-এর নিদর্শনধারী হওয়ার ব্যাপারে কি সন্দেহ হতে পারে? কিন্তু একজন দুষ্ট বিরুদ্ধবাদী বলতে পারে, তাঁর কিছু ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হযেছে যেভাবে আজ পর্যন্ত ইহুদীরা বলে থাকে, যীশু মসীহের কোন ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নি। তিনি বলেছিলেন, আমার বার জন শিষ্য স্বর্গে বার সিংহাসনে বসবে। কিন্তু তারা বার থেকে এগার রয়ে গেল এবং একজন মুরতাদই হয়ে গেল। অনুরূপভাবে তিনি বলেছিলেন, এ যুগের লোক মৃত্যুবরণ করবে যতক্ষণ আমি ফিরে না আসি অথচ সেই যুগতো দূরের কথা আঠার শ' বছরের মানুষ কবরে প্রবেশ করেছে, কিন্তু তিনি এখনও আসেন নি, আর এ যুগে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হলো। তিনি বলেছিলেন, আমি ইহুদীদের বাদশাহ অথচ কোন রাজত্ব তার ভাগ্যে জোটে নি। অনুরূপভাবে আরও অনেক আপত্তি রয়েছে। একইভাবে এ যুগে কিছু সংখ্যক মন্দ স্বভাবের লোক আঁ হযরত (সা.)-এর কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণীর উপর আপত্তি করে আর পরিণামস্বরূপ সব ভবিষ্যদ্বাণীকে অস্বীকার করে। কোন কোন লোক হুদায়বিয়ার ঘটনার উল্লেখ করে থাকে। এ ধরনের আপত্তি গ্রহণযোগ্য হলে এ লোকদের প্রতি আমার আক্ষেপের কী আছে! কিন্তু ভয়ের বিষয় হলো, যারা পদ্ধতি অবলম্বন করে তারা পাছে ইসলামকে না বিদায় দিয়ে বসে! সব নবীর ভবিষ্যদ্বাণীর মত আমার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহে ইজতিহাদের ভূমিকা যদি থেকেই থাকে যেমন আঁ হযরত (সা.)-এর হুদায়বিয়ার সফরেও ইজতিহাদের ভূমিকা ছিল বলেই তো তিনি সফর করেন। কিন্তু সেই

ইজতিহাদ সঠিক প্রমাণিত হয় নি। ইজতিহাদে ভুল-ভ্রান্তি হয়ে গেলেও নবীর মহিমা, জালাল এবং সম্মানের এতে কোন তারতম্য হয় না। যদি বলেন, এর ফলে তো বিশ্বাস উঠে যায়, তবে এর উত্তর হলো, ওহীর আধিক্য সে বিশ্বাসের রক্ষণাবেক্ষণ করে। কখনও নবীর ওহী একক সংবাদ সম্বলিত হয় আর একই সাথে সংক্ষিপ্তও হয়ে থাকে। কোন সময় কোন এক বিষয়ে ওহী অজস্র ধারায় ও সুস্পষ্ট হয়ে থাকে। সুতরাং সংক্ষিপ্ত ওহীর ইজতিহাদে কোন ভুল হলেও, স্পষ্ট ও অকাট্য ওহীতে এর ফলে কোন আঘাত আসে না। সুতরাং আমি এ কথা অস্বীকার করতে পারি না যে, আমার ওহীও কখনও একক সংবাদের মত হতে পারে বা সংক্ষিপ্তও হতে পারে এবং এ বুঝতে ইজতিহাদী প্রকৃতির ভ্রান্তিও হতে পারে। এ বিষয়ে সব নবী শামিল রয়েছেন। মিথ্যাবাদীর উপর খোদাতাআলার অভিশাপ হোক। একই সাথে শাস্তির ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে আর একটি কথা হলো, খোদার জন্য সেগুলোকে প্রকাশ করা আবশ্যক নয়। ইউনুস (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী এর সাক্ষী। সব নবীর এ বিষয়ে মতৈক্য রয়েছে যে, খোদার ইচ্ছা যা শাস্তির আকারে থেকে থাকে তা সদকা এবং দোয়ার সাহায্যে টলে যেতে পারে। তাই শাস্তির ভবিষ্যদ্বাণী যদি টলতে না পারে, তাহলে সদকা এবং দোয়া অর্থহীন।

এখন আমি এ বক্তৃতা শেষ করছি এবং খোদাতাআলাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যে, রোগ এবং শারিরীক দুর্বলতা সত্ত্বেও আমাকে এ বক্তৃতা লেখার সামর্থ্য দান করেছেন। আমি প্রভুর সমীপে দোয়া করবো যেন এ বক্তৃতাকে অগণিত মানবতার জন্য সৎপথ প্রদর্শনের কারণ করেন, যেভাবে এ জনসভায় বাহ্যিক সংবদ্ধতা দেখা যাচ্ছে। অনুরূপভাবে সকল অন্তরে হেদায়াতের বেলায়ও পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও ভালবাসার সৃষ্টি করেন এবং সর্বত্র হেদায়াতের বাতাস প্রবাহিত করেন। স্বর্গীয় জ্যোতিঃ ছাড়া চোখ কিছু দেখতে পায় না, তাই খোদাতাআলা আকাশ হতে যেন রূহানী আলো অবতীর্ণ করেন যাতে চোখ দেখতে পায় এবং অদৃশ্য থেকে বাতাস সৃষ্টি করেন যেন কান শুনতে পায়। যে ব্যক্তিকে খোদা আমাদের দিকে আকর্ষণ করেন সে ছাড়া কে আছে, যে আমাদের দিকে আসতে পারে? তিনি অনেককে আকর্ষণ করছেন ও করবেন আর অনেক তালা ভাঙ্গবেন। আমাদের দাবীর মূল হলো, হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু। এ মূলে খোদা নিজের হাতে পানি সিঞ্চন করেন এবং রসুল (সা.)-এর হেফাজত করেন। খোদা নিজ কথা দিয়ে আর তাঁর রসূল স্বীয় কার্য দ্বারা অর্থাৎ চাক্ষুষ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে,

হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তিনি মে'রাজের রাতে হযরত ঈসা (আ.)-কে মৃত আত্মাদের মাঝে দেখেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তবুও মানুষ তাঁকে জীবিত মনে করেন এবং তাকে এমন বিশেষত্ব দেন যা কোন নবীকে দেয়া হয় নি। এ সব বিষয় হতেই খ্রীষ্টানদের দাবী অনুসারে হযরত মসীহ্ (আ.)-এর ঈশ্বরত্ব দৃঢ়তা লাভ করে এবং অনেক অপরিপক্ক মানুষ এ ধরনের বিশ্বাসের কারণে হোঁচট খায়। আমি সাক্ষী, খোদাতাআলা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যুবরণ করেছেন। এখন তাঁকে জীবিত করায় ধর্মের মৃত্যু সুনিশ্চিত এবং এ ধারণায় পড়া অনর্থক। ইসলামে প্রথম ইজমা' এ ছিল যে, বিগত নবীদের মাঝে কেউই জীবিত নেই। যেমন-

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

(সূরা আলে ইমরান, **3:145**)

থেকে প্রমাণিত। খোদা হযরত আবূবকর (রা.)-কে অনেক অনেক প্রতিদান দিন যিনি এ ইজমা'র কারণ ছিলেন এবং মিম্বরে চড়ে এ আয়াত পড়ে শুনিয়েছেন। অবশেষে আমরা ইংরেজ সরকারের প্রতিও সত্যিকারের আন্তরিকতার সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তারা খোলা মনে আমাদেরকে ধর্মীয় স্বাধীনতা দান করেছেন। এ স্বাধীনতার সুবাদে আমরা জনসাধারণের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় জ্ঞান পৌঁছাই। এটা সামান্য বদান্যতা নয়। এর কারণে আমরা শুধু প্রথাগতভাবে এ সরকারের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব বরং অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানানো উচিত। এ মহান সরকার যদি স্বাধীনতা প্রদান করে কয়েক লক্ষ জায়গীরও দান করতেন তবে আমরা সত্য সত্যই বলতাম যে, এ জায়গীর এর সমতুল্য নয়। কেননা পার্থিব ধনসম্পদ অস্থায়ী; কিন্তু এটা সেই ধন। এর ধ্বংস নেই। আমি স্বীয় জামাতকে নসীহত করছি। এ সদয় সরকারের প্রতি আন্তরিকতার সাথে কৃতজ্ঞ থাকুন। কেননা যে মানবের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখায় না সে খোদার প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। পুণ্যবান সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং ব্যক্তি বিশেষেরও

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার কোন দান মানুষের নিকট পৌঁছায়।

والسلام علیٰ من اتبع الھدیٰ

লেখক

মির্যা গোলাম আহ্‌মদ

১ নভেম্বর, ১৯০৪, বুধবার

সিয়ালকোট

হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) রচিত একটি ফার্সী নযমের একাংশ

حکم است ز آسماں بزمیں مے رسانمش

گر بشنوم نہ گوئمش آنزا کُجا برم

مامُورم و مرا چہ دریں کار اختیار   رو ایں سخن بگو بخداوند آمرم
اے حسرت ایں گروہِ عزیزاں مراندید   وقتے بہ بیندم کہ ازیں خاک بگذرم
ہر شب ہزار غم بمن آید ز دردِ قوم   یارب نجات بخش ازیں روز پُرشرم
بعد از رہم ہر آنچہ پسندند ہیچ نیست   بد قسمت آنکہ درنظرش ہیچ محترم
بعد از خدا بہ عشقِ محمدؐ مخمرم   گر کفر ایں بود بخدا سخت کافرم
جانم گداخت از غم ایمانت اے عزیز   ویں طرفہ ترکہ من بہ گمانِ تو کافرم
یارب ب آب چشم من ایں کسلِ شاں بشو   کامروز ترشدست ازیں درد بسترم
جانم فدا شود برہِ دینِ مصطفٰی!
این است کامِ دل اگر آید میسّرم

ফার্সী নযমের অনুবাদ

এটা স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ যা আমি ধরাপৃষ্ঠে প্রচার করছি।
শোনা সত্ত্বেও যদি আমি প্রচার করি তাহলে একে কোথায় নিয়ে যাব?
আমি মা'মুর তাই এ ব্যাপারে আমি অক্ষম,
যাও এ কথা সেই খোদাকে বল, যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন।
দুঃখের বিষয় যে, আমার স্বজনেরা আমাকে চিনতে পারে নি,
তারা আমাকে তখন চিনবেন, যখন আমি পৃথিবী থেকে প্রত্যাবর্তন করবো।
প্রত্যেক রাতে জাতির বেদনায় হাজারো (রকমের) দুঃখ পাই;
হে খোদা! আমাকে এ হট্টগোলপূর্ণ যুগ থেকে মুক্তি দাও।
আমার পথ ছেড়ে তারা যা অবলম্বন করে তা অর্থহীন।
বড় হতভাগা সেই ব্যক্তি যার দৃষ্টিতে তুচ্ছ বস্তুও মর্যাদাবান'
খোদার পর আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রেমে বিভোর
এ কুফরী হয়ে থাকলে শপথ করে বলছি, আমি পাক্কা কাফির।
হে প্রিয়! আমার প্রাণ তোমার ঈমানের বেদনায় গলে যাচ্ছে
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তোমার দৃষ্টিতে আমি কাফির।
হে খোদা! আমার নয়ন জলে তাদের এ অলসতাকে ধুয়ে দাও।
কেননা, এ বেদনায় কেঁদে কেঁদে আজকাল আমার বিছানাও ভিজে যায়।
আমার প্রাণ মুস্তাফার (সাঃ) ধর্মের জন্য উৎসর্গীত হয়ে যাক।
এটাই আমার মনোবাসনা; হায় যদি এটা পূর্ণ হতো!

হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একটি ফার্সী নযমের একাংশের অনুবাদ যা মূল (উর্দূ) পুস্তিকার প্রথম সংস্করণের পিছনের পাতায় ছাপা হয়েছিল।